ইউনিট ১৪

ইলেকট্রনিক্স (Electronics)

ভূমিকা

আধুনিক সভ্যতার যে যুগান্তকারী অগ্রগতি এর মূলে রয়েছে ইলেকট্রনিক্সের অপরিসীম অবদান। অর্ধপরিবাহী ডায়োড এবং ট্রানজিস্টরের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। তাই আধুনিক যুগকে বলা যায় ইলেকট্রনিক্সের যুগ। সকাল থেকে আরম্ভ করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এর ওপরে আমাদের নির্ভরশীল হতে হয়। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ভিসিডি দৈনন্দিন ব্যবহার্য অনেক জিনিসপত্রে রয়েছে ইলেকট্রনিক্সের উপস্থিতি। অফিস আদালত, কারখানা ইত্যাদিতে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েই চলেছে। একবিংশ শতাব্দীতে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে নিঃসন্দেহে।

'ইলেকট্রন' শব্দটি থেকে ইলেকট্রনিক্সের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের যে শাখায় ভ্যাকুয়াম (Vacuum), গ্যাস, অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর মাধ্যমে ইলেকট্রনের প্রবাহ নিয়ে কাজ করা হয়, সে শাখাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক্স (Electronics)। বর্তমানে ভ্যাকুয়াম ও গ্যাস নির্ভর ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের ব্যবহার ভীষণভাবে কমে গেছে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে এখন অর্ধপরিবাহী পদার্থের ব্যবহারই সর্বাধিক। তাই এ ইউনিটে আমরা অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর, ডায়োড এবং ট্রানজিস্টরের ব্যবহার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করবো।

পাঠ ১ অর্ধপরিবাহী ব্যান্ডতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা, ডোপিং এবং n- টাইপ ও p- টাইপ অর্ধপরিবাহী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্ধপরিবাহী পদার্থ কি বলতে পারবেন;
- ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে অর্ধপরিবাহী, পরিবাহী এবং অন্তরক পদার্থের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্ধপরিবাহীর শ্রেণীভেদ বলতে পারবেন;
- সহজাত বা বিশুদ্ধ এবং বহিঃজাত বা অপদ্রব্য মিশ্রিত অর্ধপরিবাহীর পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- n- টাইপ ও p টাইপ অর্ধপরিবাহী কাকে বলে বলতে পারবেন;
- n- টাইপ ও p টাইপ অর্ধপরিবাহী পদার্থ কিভাবে তৈরি হয় বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১.১ ঃ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) ঃ

বিদ্যুৎ পরিবাহীতার পার্থক্য অনুসারে সব পদার্থকে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অন্তরক এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করতে পারে সেগুলোকে আমরা বলি পরিবাহী (conductor)। যেমন– সোনা, রূপা, তামা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। আবার এক ধরনের পদার্থ আছে যার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না বা করলেও অতি সামান্য। এদেরকে বলা হয় অন্তরক (insulator)। যেমন রাবার, কাঠ, কাঁচ, প্লাস্টিক ইত্যাদি। পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি এক ধরনের পদার্থ আছে সেগুলোর বিদ্যুৎ পরিবাহীতা পরিবাহী পদার্থের চেয়ে কম, আবার অন্তরকের চেয়ে বেশি, এদেরকে বলা হয় অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর পদার্থ। যেমন– জার্মেনিয়াম, সিলিকন, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, ক্যালসিয়াম সালফাইড ইত্যাদি। আপেক্ষিক রোধের মান থেকে এসব পদার্থের পার্থক্য অনুমান করা যায়। যেমন– স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তামার আপেক্ষিক রোধ 10^{-8} ওহম-মিটার, কাঁচের আপেক্ষিক রোধ 10^{16} ওহম-মিটার। অন্যদিকে অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ 10^{-5} থেকে 10^{8} ওহম-মিটারের মধ্যে।

অর্ধপরিবাহী পদার্থ হিসেবে জার্মেনিয়াম ও সিলিকন নামক দুটি মৌলিক পদার্থ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ বা ডিভাইস (Device) সাধারণতঃ জার্মেনিয়াম ও সিলিকন থেকে তৈরি করা হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী পদার্থ অন্তরক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে অর্ধপরিবাহী পদার্থের রোধ দ্রুত কমে যায় অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহীতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সুপরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে এর উল্টো ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ বাড়ে। এটাই পরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর সবচেয়ে বড় পার্থক্য।

সুতরাং অর্ধপরিবাহী পদার্থ বলতে আমরা সেসমস্ত পদার্থ বুঝবো যেগুলোর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়।

৩.১.২ ঃ ব্যান্ডতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা

আমরা জানি, একটি পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। পরমাণু গঠন সম্পর্কিত বোর (Bohr) এর তত্ত্ব অনুসারে পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রন। ইলেকট্রনগুলো কেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তন করে (চিত্র–১৪.১)

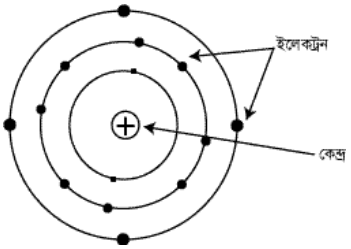

চিত্র–১৪.১ ঃ পরমাণুর গঠন

কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক এবং নিউট্রনের কোন চার্জ নেই, এরা তড়িৎ নিরপেক্ষ। ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক। একটি সস্থিত পরমাণুতে সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকায় এটি চার্জ নিরপেক্ষ। ধনাত্মক চার্জ সমৃদ্ধ কেন্দ্র ঋণাত্মক ইলেকট্রনকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কেন্দ্রবিমুখ (centrifugal) বলের কারণে ইলেকট্রনগুলো কেন্দ্রে নিপতিত হয় না।

চিত্র–১৪.১ এ একটি সিলিকন পরমাণু দেখানো হয়েছে। এতে 14টি ইলেকট্রন ও 14টি প্রোটন রয়েছে। ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষে বিন্যস্ত। ১ম কক্ষে ২টি ইলেকট্রন, দ্বিতীয় কক্ষের ৪টি ইলেকট্রন এবং বাইরের কক্ষে ৪টি ইলেকট্রন রয়েছে। বহিঃকক্ষের ৪টি ইলেকট্রনকে বলা হয় যোজন বা ভ্যালেন্স (Valence) ইলেকট্রন। পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী এ যোজন ইলেকট্রনের উপরে নির্ভরশীল বিধায় বহিঃকক্ষের ইলেকট্রন বিন্যাসই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। এ কক্ষপথগুলো নির্দিষ্ট শক্তি দ্বারা চিহ্নিত। চিত্র–১৪.২ এ কেন্দ্র, বিভিন্ন কক্ষপথ এবং এদের শক্তিস্তর দেখানো হয়েছে।

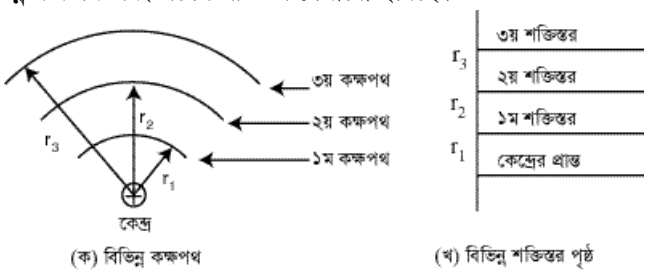

চিত্র–১৪.২ (ক) বিভিন্ন কক্ষপথ (খ) বিভিন্ন শক্তিস্তর পৃষ্ঠ

চিত্রে r_1 , r_2 , r_3 ইত্যাদি কতগুলো কক্ষপথ। এদের মধ্যবর্তী স্থানে কোন কক্ষপথ নেই এবং ইলেকট্রন মধ্যবর্তী স্থানে থাকতে পারে না বলে এগুলো ইলেকট্রনের জন্য নিষিদ্ধ অঞ্চল। সিলিকন বা অন্য যে কোন কঠিন পদার্থের যখন কেলাস তৈরি হয় তখন এরকম বহু সংখ্যক (লক্ষ-কোটি) পরমাণু একত্রে পাশাপাশি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সজ্জিত হয়ে কেলাস গঠন করে। যে কোন কেলাসের বৈশিষ্ট্য হলো পরমাণুর পর্যায়ক্রমিক নির্দিষ্ট অবস্থানে ত্রিমাত্রিক বিন্যাস। অর্থাৎ কেলাসে পরমাণুগুলো নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করে। কেলাস গঠনের জন্য যখন পরমাণুগুলো কাছাকাছি নির্দিষ্ট অবস্থানে আসে, তখন মুক্ত পরমাণুর কক্ষ বিন্যাস বা শক্তিস্তরের পরিবর্তন ঘটে। কেলাস গঠনের সময় পরমাণুগুলো কাছাকাছি আসে এবং পরমাণুর বাইরের কক্ষের চার্জের উপস্থিতির কারণে ইলেকট্রনের কক্ষপথ প্রভাবিত হয়। তখন পাউলির নীতি (Pauli's Principle) অনুসারে দুটো ইলেকট্রন কখনোই একই ধরনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে থাকে না। এ কারণে প্রতিটি ইলেকট্রনের কক্ষপথ ভিন্ন হয়। ফলে যে কোন কক্ষপথের ইলেকট্রন মুক্ত ইলেকট্রনের ন্যায় সুনির্দিষ্ট একক শক্তিস্তরের পরিবর্তে অত্যন্ত কাছাকাছি মানের শক্তির গুচ্ছ বা ব্যান্ডএ থাকে (চিত্র–১৪.৩)। এ ধরনের খুবই কাছাকাছি এবং খুবই সামান্য শক্তি পার্থক্যের এগুচ্ছকেই 'শক্তিগুচ্ছ' বা 'শক্তিব্যান্ড' বলে।

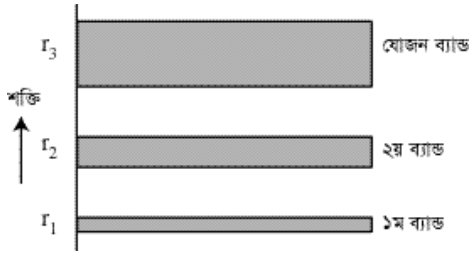

চিত্র–১৪.৩ ঃ শক্তি ব্যান্ড

চিত্র–১৪.৩ এ লক্ষণীয় বিষয় হলো যে শক্তিব্যান্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ব্যান্ডের তুলনায় যোজন ব্যান্ডের প্রশস্ততা অনেক বেশি। এর কারণ হলো পরমাণুর যোজন ইলেকট্রন বহিঃকক্ষে থাকায় পারিপার্শ্বিক পরমাণুর চার্জ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। তাই প্রশস্ততাও বেশি হয়। যোজন ব্যান্ড আংশিক বা সম্পূর্ণ পূর্ণ থাকতে পারে, তবে কখনোই সম্পূর্ণ খালি থাকে না। এ যোজন ব্যান্ডের ওপরে থাকে আরেক ধরনের ব্যান্ড যাকে বলা হয় পরিবহন ব্যান্ড। এটাই সর্বনিম্ন অপূর্ণ ব্যান্ড। পরিবহন ব্যান্ডের বৈশিষ্ট্য হলো যে এ ব্যান্ডে যখন ইলেকট্রন থাকে বা অন্য ব্যান্ড থেকে প্রবেশ করে তখন সেগুলো প্রায় মুক্ত ইলেকট্রনের ন্যায় বিচরণ করে। এ ইলেকট্রনগুলোই পদার্থে বিদ্যুৎ প্রবাহে অংশ নেয়।

যোজন ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের শক্তিস্তরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাকে বলা হয় ব্যান্ড গ্যাপ (band gap)। এ পার্থক্যের বিভিন্নতা এবং প্রকৃতির ওপরে নির্ভর করে কোন পদার্থ পরিবাহী, কোনটি অন্তরক আবার কোনটি অর্ধপরিবাহী হয়। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

৩.১.৩ ঃ ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে পরিবাহী, অন্তরক ও অর্ধপরিবাহীর পার্থক্য ঃ

পরিবাহী ঃ পরিবাহী পদার্থে যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে আংশিক উপরিপাত (overlapping) হয়। আসলে এ দুই ব্যান্ডের মধ্যে ভৌত পার্থক্য নির্ধারণ করা কঠিন। সুতরাং পরিবাহী পদার্থে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা মাত্র মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

অন্তরক ঃ অন্তরক পদার্থে যোজন ব্যান্ড সম্পূর্ণ পূর্ণ থাকে এবং পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ খালি থাকে এবং এ দুই ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি পার্থক্য অনেক বেশি থাকে (সাধারণত: 10ev এর বেশি)। পরিবহন ব্যান্ডে ইলেকট্রন না থাকায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে না। যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে কোন ইলেকট্রন নিতে হলে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রা অনেক বাড়ালে কিছু কিছু ইলেকট্রন যথেষ্ট শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে এবং ঐ ইলেকট্রনগুলো বিদ্যুৎ প্রবাহে অংশ নিতে পারে।

অর্ধপরিবাহী ঃ অর্ধপরিবাহী পদার্থের যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি পার্থক্য অন্তরকের তুলনায় অনেক কম থাকে। যেমন সিলিকনের ক্ষেত্রে এর মান 1.1 ev এবং জার্মেনিয়াম কেলাসের জন্য 0.7ev। পরম শূন্য তাপমাত্রায় পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ খালি এবং যোজন ব্যান্ড সম্পূর্ণ পূর্ণ থাকে, তাই এ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী আদর্শ অন্তরক হয়। কম তামপত্রায় পরিবহন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ এবং যোজন ব্যান্ড আংশিক খালি থাকে। তাপমাত্রা বাড়ালে যোজন ব্যান্ড থেকে অধিক পরিমাণ ইলেকট্রন শক্তি সঞ্চয় করে পরিবহন ব্যান্ডে প্রবেশ করে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহে অংশগ্রহণ করে। তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। চিত্র–১৪.৪ এ ব্যান্ড চিত্রের সাহায্যে পরিবাহী, অন্তরক ও অর্ধপরিবাহী পদার্থের পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

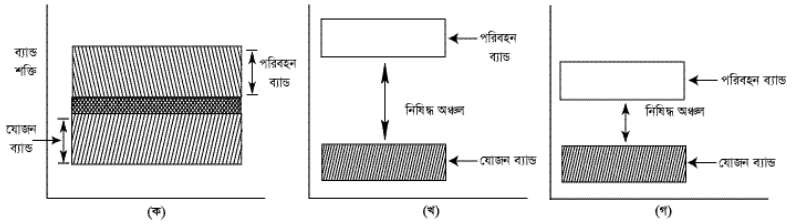

চিত্র–১৪.৪ (ক) পরিবাহীর ব্যান্ড চিত্র (খ) অন্তরকের ব্যান্ড চিত্র (গ) অর্ধপরিবাহীর ব্যান্ড চিত্র।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে সিলিকন বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। চিত্র–১৫.৫ এ সিলিকনের ব্যান্ড চিত্র দেখানো হলো। চিত্র–১৫.৫ (ক) তে সিলিকনের পরমশূন্য তাপমাত্রার ব্যান্ড চিত্র এবং (খ) চিত্রে কক্ষ তাপমাত্রার অবস্থা দেখানো হয়েছে।

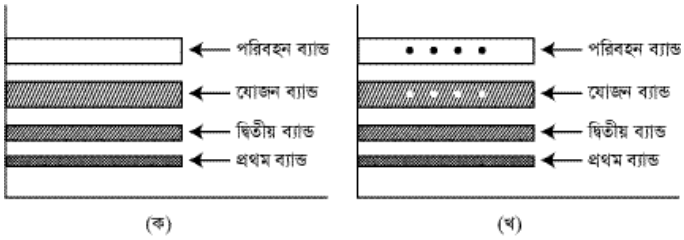

চিত্র–১৫.৫। (ক) পরম শূন্য তাপমাত্রায় (খ) কক্ষতাপমাত্রায়।

৩.১.৪ ঃ অর্ধপরিবাহীর শ্রেণীভেদ ও ডোপিং

অর্ধপরিবাহী পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) সহজাত বা বিশুদ্ধ (Intrinsic) অর্ধপরিবাহী ও (খ) বহিঃজাত বা অশুদ্ধ (Extrinsic) অর্ধপরিবাহী।

বাহক চার্জের প্রকৃতি অনুসারে, বহিঃজাত বা অশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীকে আবার দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়–

(i) n-টাইপ অর্ধপরিবাহী

(ii) p- টাইপ অর্ধপরিবাহী।

(ক) সহজাত বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী ঃ

জার্মেনিয়াম বা সিলিকন পরমাণুর বাইরের কক্ষে ৪টি যোজন ইলেকট্রন থাকে। যে কোন পরমাণুর বাইরের কক্ষে সর্বোচ্চ ৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। ৮টি ইলেকট্রন থাকলে পরমাণুটি নিষ্ক্রিয় পরমাণুর প্রকৃতি লাভ করে এবং সুস্থির অবস্থায় থাকে। প্রত্যেক পরমাণুই ৮টি ইলেকট্রন পেতে আগ্রহী এবং সুস্থির অবস্থায় থাকতে চায়। জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি এ ধরনের পরমাণু প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত 4টি ইলেকট্রন সংগ্রহ করে ঠিক পাশের পরমাণু থেকে। এক্ষেত্রে পাশের পরমাণু এর ৪টি ইলেকট্রন একেবারে না দিয়ে অর্থাৎ স্থানান্তর না করে পরস্পর নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে ৮টি ইলেকট্রন প্রাপ্ত হয়ে এক বিশেষ ধরনের ব্যান্ড বা গ্রন্থি রচনা করে। এ ধরনের গ্রন্থিকে বলা হয় সমযোজী গ্রন্থি (Covalent bond)। চিত্র–১৪.৬ এ জার্মেনিয়াম কেলাসের এ ধরনের সমযোজী গ্রন্থি রচনার একটি চিত্র দেখানো হয়েছে।

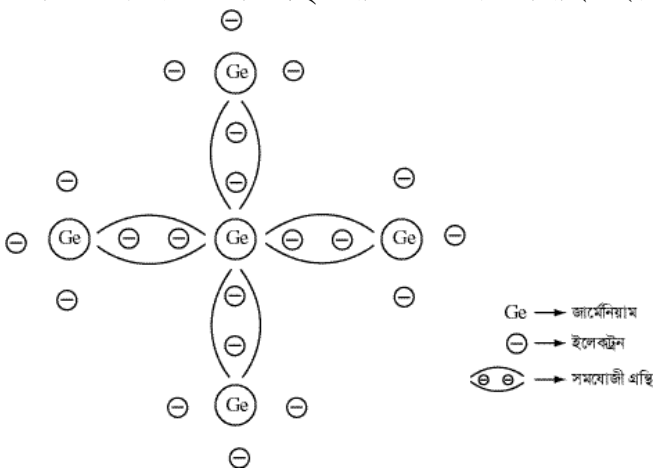

চিত্র–১৪.৬

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জার্মেনিয়াম বা সিলিকন সমযোজী গ্রন্থির সাহায্যে বিশুদ্ধ কেলাস (Intrinsic crystal) গঠন করেছে। কোন মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না বলে কম তাপমাত্রায় এদের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তাপীয় উত্তেজনায় কেলাসের পরমাণুর কিছু কিছু গ্রন্থি ভেঙ্গে যায় এবং ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে যাওয়ার মত যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করলে পরিবহন ব্যান্ডে স্থানান্তরিত হয়। পরিবহন ব্যান্ডের ইলেকট্রন মুক্ত ইলেকট্রনের মত আচরণ করে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহে অংশগ্রহণ করে। যোজন ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে যোজন ব্যান্ডে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। একেই আমরা বলি যে যোজন ব্যান্ডে গর্ত বা হোলের (hole) সৃষ্টি হয়েছে। ইলেকট্রন যেহেতু ঋণাত্মক আধানযুক্ত, তাই যোজন ব্যান্ডে ইলেকট্রনের ঘাটতি হওয়ার জন্য মনে করা হয় যে যোজন ব্যান্ডে ধনাত্মক আধানযুক্ত হোলের সৃষ্টি হয়েছে। চিত্র ১৫.৫(খ)।

এখন যোজন ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে চলে যাওয়ায় যে হোলের সৃষ্টি হয় তা পূরণ করার জন্য যোজন ব্যান্ডের পাশের ইলেকট্রন ঐ হোল পূরণ করতে ছুটে আসে। পাশের ইলেকট্রন চলে আসায় সেখানে আবার হোলের সৃষ্টি হয়, সেটি পূরণ করার জন্য আশেপাশের ইলেকট্রন ছুটে আসে। এ প্রক্রিয়া যোজন ব্যান্ডে চলতে থাকে।

অবশ্য বিভিন্ন দিকে হোলের স্থানান্তরের সম্ভাবনা সমান থাকায় কোন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না। কিন্তু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে ক্ষেত্রের দিকে হোলের প্রবাহের একটি নীট প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে যেমন পরিবহন ব্যান্ডের ইলেকট্রনের প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তেমনি যোজন ব্যান্ডের হোলের অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একটি অর্ধপরিবাহী পদার্থে ইলেকট্রন এবং হোল উভয়ই বিদ্যুৎ বাহক (charge carrier) হিসেবে কাজ করে।

হোলের গতি যেদিকে ইলেকট্রনের গতি তার বিপরীত দিকে। বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে যতগুলো যুক্ত ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয় সমযোজী বন্ড ভেঙ্গে ততগুলো হোলেরও সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে হোল ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে।

(খ) বহিঃজাত বা অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে তাপীয় ক্রিয়ায় সৃষ্ট মুক্ত ইলেকট্রন ও হোলের সংখ্যা খুবই কম থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে খুব সামান্য পরিমাণ (মিলিয়ন বা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) বিশেষ ধরনের অপদ্রব্য মিশালে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ বাহক (charge carriers) পাওয়া সম্ভব। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এ মিশ্রণকে বলা হয় ডোপিং (Doping)। মিশ্রণযুক্ত কেলাসকে বলা

হয় অবিশুদ্ধ কেলাস। জার্মেনিয়াম বা সিলিকন অর্ধপরিবাহী কেলাসে অপদ্রব্য হিসেবে ত্রিযোজী বা পঞ্চযোজী (যেমন এ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম, আর্সেনিক ইত্যাদি) মৌল (element) মেশানো হয়। অপদ্রব্য পদার্থের যোজনীর উপরে নির্ভর করে অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা–n টাইপ ও p-টাইপ। নিচে আমরা এ দুধরনের অর্ধপরিবাহী আলোচনা করবো।

(i) n-টাইপ অর্ধপরিবাহী ঃ Negative শব্দের আদ্যক্ষর n থেকে n-টাইপ নামকরণ করা হয়েছে ৪ যোজী বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কেলাসের সঙ্গে পঞ্চযোজী মৌল, যেমন এন্টিমনি বা আর্সেনিক মিশিয়ে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী কেলাস তৈরি করা হয়। এ মিশ্রণ ঘটানো হয় উচ্চতাপে এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপদ্রব্য নির্দিষ্ট অবস্থানে প্রবেশ করে। মিশ্রণের সময় অপদ্রব্যের পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেন এর পরমাণুগুলো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর কেলাসের মূল কাঠামোর (structure) কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেলাস ল্যাটিস (crystal lattice) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। পঞ্চযোজী মৌলের ৫টি যোজন (valence) ইলেকট্রনের ৪টি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর (যেমন জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি) ৪টি যোজন ইলেকট্রনের সঙ্গে সমযোজী গ্রন্থি রচনা করে। সুতরাং প্রতিটি পঞ্চযোজী পরমাণুর জন্য একটি ইলেকট্রন কোন গ্রন্থি রচনা না করে মুক্ত অবস্থায় থাকে। এ মুক্ত ইলেকট্রন কেলাসের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে।

সুতরাং অপদ্রব্য হিসেবে যতগুলো পরমাণু মিশ্রিত হবে ঠিক ততগুলো মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যাবে। পঞ্চ যোজী পরমাণু এ মুক্ত ইলেকট্রন দান করে বলে এদেরকে দারা donar বলা হয়। এছাড়াও তাপীয় উত্তেজনার জন্য কিছু কিছু বন্ড ভেঙ্গে সমসংখ্যক ইলেকট্রন ও হোল সৃষ্টি হয়। সুতরাং n টাইপ অর্ধপরিবাহিতে ইলেকট্রন ও হোল উভয়ই উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর তুলনায় ইলেকট্রনের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। অর্থাৎ ইলেকট্রনের সংখ্যা হোলের তুলনায় বহুগুণ বেশি থাকে। এ সমস্ত পদার্থে বিদ্যুৎ প্রবাহে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রনই মুখ্যভূমিকা পালন করে বলে এদেরকে n টাইপ অর্ধপরিবাহী বলা হয়।

চিত্র–১৪.৭ এ একটি n টাইপ অর্ধপরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রন দেখানো হয়েছে। n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রনকে বলা হয় সংখ্যাগুরু বাহক (majority carriers) এবং হোল বিদ্যুৎ প্রবাহে গৌণ ভূমিকা পালন করে বলে এদেরকে বলা হয় সংখ্যালঘু বাহক (minority carriers)।

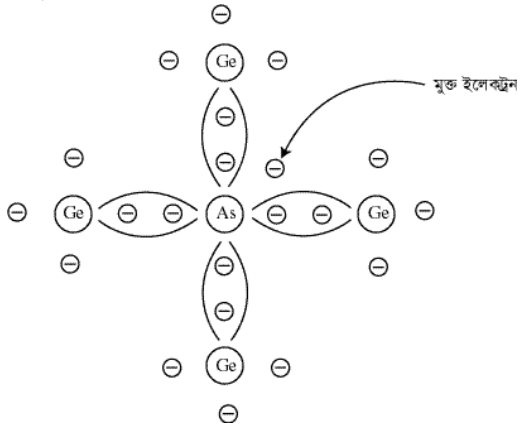

চিত্র–১৪.৭ ঃ n-টাইপ অর্ধপরিবাহী

(ii) p-টাইপ অর্ধ পরিবাহী ঃ Positive শব্দের আদ্যাক্ষর p থেকে p- টাইপ অর্ধপরিবাহীর নামকরণ করা হয়েছে। এ সমস্ত পদার্থে positive অর্থাৎ ধনাত্মক হোল বিদ্যুৎ প্রবাহে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই এদেরকে p টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

একটি বিশুদ্ধ ৪ যোজী অর্ধপরিবাহীতে ৩ যোজী মৌল যেমন গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম ইত্যাদি অপদ্রব্য মিশিয়ে p-টাইপ অর্ধপরিবাহী কেলাস তৈরি করা হয়। n টাইপের মত বিশেষ প্রক্রিয়ায় উচ্চতাপে এ মিশ্রণ ঘটানো হয়। ৩ যোজী মৌলের ৩টি যোজন ইলেকট্রন রয়েছে। এ ধরনের পরমাণু তাদের চারপাশে অবস্থিত বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর ৪টি যোজন ইলেকট্রনের ৩টি সঙ্গে সমযোজী গ্রন্থি তৈরি করে। কিন্তু বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর চতুর্থ যোজন ইলেকট্রন কোন বন্ধন তৈরি করে না কারণ ৩ যোজী মৌলের একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতির কারণে ৩ যোজী পরমাণুতে একটি হোলের সৃষ্টি হবে। এভাবে সৃষ্ট হোলগুলো ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হতে আগ্রহী থাকবে। এজন্য এ ৩ যোজী পরমাণুকে বলা হয় গ্রহীতা (Acceptor)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি ৩ যোজী পরমাণুর জন্য একটি করে হোলের সৃষ্টি হবে। এদের সংখ্যা প্রতি ঘন সেন্টিমিটার প্রায় 10^{17} সংখ্যক। ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী হোলের সংখ্যা তাপীয়ভাবে সৃষ্ট ইলেকট্রনের চেয়ে বহুগুণ বেশি থাকে বলে p টাইপ কেলাসে ধনাত্মক চার্জ বিদ্যুৎ প্রবাহে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই এক্ষেত্রে হোল 'সংখ্যাগুরু বাহক'

এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা খুব সামান্য হওয়ায় এদেরকে 'সংখ্যালঘু বাহক' বলে। চিত্র–১৪.৮ এ একটি p টাইপ কেলাস দেখানো হয়েছে।

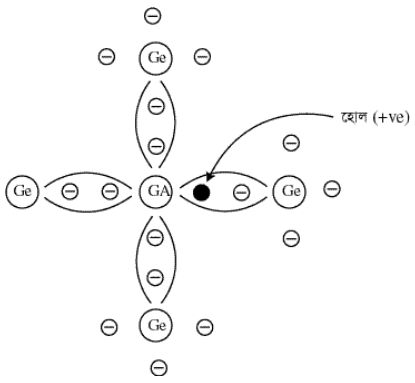

চিত্র–১৪.৮ ঃ p টাইপ কেলাস

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর যোজন ইলেকট্রনের চেয়ে অপদ্রব্যের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা কম হলে p-টাইপ কেলাস এবং বেশি হলে n-টাইপ কেলাস হবে। তবে এভাবে সৃষ্ট n- বা p টাইপ কেলাস তড়িৎ নিরপেক্ষ কেননা n-টাইপ কেলাসের অতিরিক্ত ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জ আর্সেনিক পরমাণুর নিউক্লিয়াস দ্বারা এবং p টাইপ কেলাসের সৃষ্ট গর্তের (hole) ধনাত্মক চার্জ গ্যালিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জের ঘাটতি পূরণ করে নিষ্ক্রিয় হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্নাবলী ঃ

১। ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?

২। যোজন ইলেকট্রন কি?

৩। ইলেকট্রনিক্সের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লিখুন।

৪। অর্ধপরিবাহী পদার্থ কাকে বলে?

৫। অর্ধপরিবাহী পদার্থ কয় প্রকার ও কি কি?

৬। সহজাত বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন ও হোলের সংখ্যা কিরূপ?

৭। বহিঃজাত বা অপদ্রব্য মিশ্রিত অর্ধপরিবাহী কয় প্রকার ও কি কি?

৮। n-টাইপ ও p-টাইপ অর্ধপরিবাহী কি?

৯। হোল কি?

১০। একটি পরমাণুর কেন্দ্রে কি থাকে?

পাঠ ৩ জাংশন ডায়োড ও I-V রেখ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জাংশন ডায়োড কি বলতে পারবেন;
- p-n জাংশন তৈরির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- p-n জাংশন কিভাবে কাজ করে বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রতিবন্ধক স্তর (Depletion layer) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ডায়োডে সম্মুখ ঝোঁক এবং বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগের ক্রিয়া (effect) বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাংশন ডায়োডের I-V রেখ অংকন করতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্রেক ডাউন (breakdown) ভোল্টেজ বা জেনার (Zener) ভোল্টেজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.২.১ ঃ p-n জাংশন ঃ অর্ধপরিবাহী ডায়োড

একটি p-টাইপ এবং একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ ব্যবস্থায় সংযুক্ত করলে সংযোগ পৃষ্ঠকে p-n জাংশন বলে। চিত্র–১৪.৯ এ একটি p-n জাংশন ব্লকচিত্রে দেখানো হয়েছে।

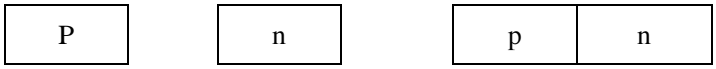

(ক) (খ) (গ)

চিত্র–১৪.৯। (ক) (খ) যথাক্রমে একটি p-টাইপ ও একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহী দেখানো হয়েছে। (গ) একটি p-n জাংশন দেখানো হয়েছে।

একটি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কেলাসের এক অংশে p-বা n-টাইপ সৃষ্টিকারী অপদ্রব্য এবং অপর অংশে যথাক্রমে n- বা p-টাইপ সৃষ্টিকারী অপদ্রব্য অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় মিশিয়ে p-n জাংশন তৈরি করা হয়। এ p-n জাংশনের বিশেষত্ব হলো এই যে, জাংশনের মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র এক ধরনের আধান বাহক (charge carrier) অনায়াসে প্রবাহিত হতে পারে কিন্তু বিপরীতধর্মী বাহক প্রবাহিত হতে পারে না।

এ p-n জাংশনকেই জাংশন ডায়োড বা সংক্ষেপে ডায়োড বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহ একমুখীকরণে এবং অনেক ইলেকট্রনিক ডিভাইসে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

৩.২.২ ঃ প্রতিবন্ধক স্তর (Depletion Layer) সৃষ্টি

p-n জাংশনের যেপার্শ্বে p-টাইপ অঞ্চল থাকে সেখানে হোলের আধিক্য রয়েছে। আবার n-টাইপ অঞ্চলে ইলেকট্রনের আধিক্য বেশি। p এবং n-টাইপ অঞ্চল যখন জাংশন তৈরির জন্য যুক্ত হয়, তখন যেহেতু জাংশনের একদিকে হোলের এবং অপরদিকে ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে, তাই ব্যাপন ক্রিয়ার (Diffusion) মাধ্যমে হোল p-অঞ্চল থেকে n-অঞ্চলের দিকে এবং ইলেকট্রন n অঞ্চল থেকে p অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। ইলেকট্রন ও হোল বিপরীত আধানযুক্ত হওয়ায় এ ব্যাপন ক্রিয়া ঘটে। জাংশনের কাছাকাছি অঞ্চলে ইলেকট্রন ও হোল মিলিত হয়ে নিরপেক্ষ হয়। এখন n-টাইপের যে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন জাংশনের দিকে ছুটে যায় তা ধনাত্মক আয়ন হয় এবং বিপরীত ঘটনা ঘটে p-অঞ্চলের পরমাণুতে। অর্থাৎ p-অঞ্চলের যে পরমাণু থেকে হোল জাংশনের দিকে আসে তা ঋণাত্মক আয়নে (ion) রূপান্তরিত হয়। এখন n-অঞ্চলে জাংশনের কাছে ধনাত্মক আয়ন সৃষ্টি হওয়ায় p-অঞ্চল থেকে আগত হোলকে (সমধর্মী আধানযুক্ত হওয়ায়) বিকর্ষণ করে। একইভাবে p-অঞ্চলে সৃষ্ট ঋণাত্মক আয়ন n-অঞ্চল থেকে আগত ইলেকট্রনকে বিকর্ষণ করে। এভাবে সংযোগস্থলে একটি পাতলা পর্দার স্তর সৃষ্টি হয় যা চার্জ প্রবাহে বাধা প্রদান করে। এ অঞ্চল বা স্তরকে বলা হয় প্রতিবন্ধক অঞ্চল বা স্তর (Depletion Layer)। এ অঞ্চলকে 'জাংশন প্রাচীর'ও (Junction barrier) বলা হয়। এ জাংশনে সামান্য পরিমাণ অভ্যন্তরীণ বিভব পার্থক্য V_O সৃষ্টি হয় (চিত্র–১৪.১০)। এ কারণে অনেক সময় একে বিভব পার্থক্য প্রাচীরও (Potential barrier) বলে। এর মান সাধারণত 0.1 থেকে 0.3 ভোল্ট হয়।

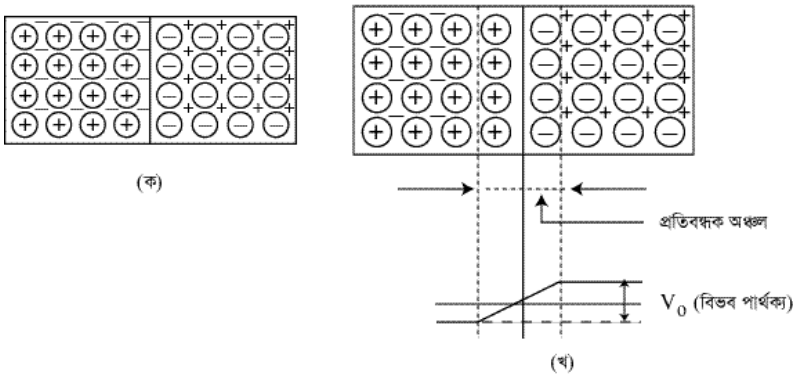

চিত্র–১৪.১০ ঃ (ক) ব্যাপন ক্রিয়া; (খ) বিভব পার্থক্য প্রাচীর V_O।

৩.২.৩ ঃ জাংশনে সম্মুখ ঝোঁক এবং বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগ (Forward and Reverse biasing)

পূর্বের অংশে আমরা জেনেছি যে, জাংশনে বিভব প্রাচীর V_O সৃষ্টি হয়। V_O বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে যা n-অঞ্চল থেকে সংখ্যাগুরু বাহক ইলেকট্রন এবং p-অঞ্চল থেকে সংখ্যাগুরু বাহক হোলকে প্রাচীর অতিক্রমে বাধা সৃষ্টি করে। এখন বাইরে থেকে যদি বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয়, তবে এ প্রাচীরের বাধা দানের ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। বাইরে থেকে দুভাবে বিভব পার্থক্য বা ভোল্টেজ প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

(ক) সম্মুখ ঝোঁক ঃ যখন জাংশনে বহিভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যাতে বিভব প্রাচীর হ্রাস পায় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু হয় তখন একে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগ করা বুঝায়। এক্ষেত্রে ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপের প্রান্তের সাথে এবং ঋণাত্মক প্রাপ্ত n টাইপের প্রান্তের সাথে সংযোগ দেয়া হয় (চিত্র–১০)। চিত্রে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগের ফলে বিভব প্রাচীরের হ্রাস দেখানো হয়েছে। প্রযুক্ত ভোল্টেজের জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রটি প্রাচীরের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে কাজ করে; সুতরাং লব্ধি ক্ষেত্র হ্রাস পায়। এর ফলে প্রাচীরের উচ্চতা কমে যায়। প্রাচীরের উচ্চতা বা বিভব পার্থক্য যেহেতু খুবই কম সুতরাং সামান্য ভোল্টেজ প্রয়োগেই প্রাচীর লোপ পায়। জাংশনে বাধা না থাকায় সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়; এ প্রবাহকে বলা হয় সম্মুখ বিদ্যুৎ প্রবাহ (Forward currency)।

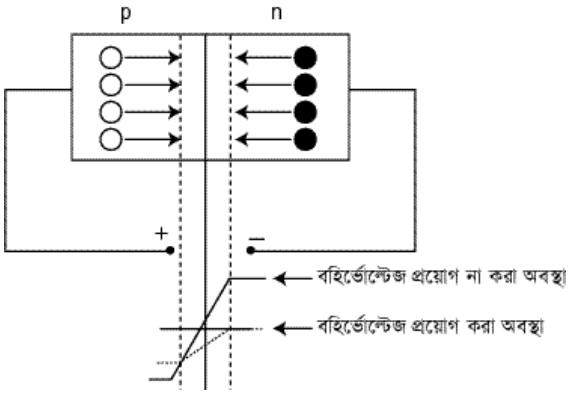

চিত্র–১৪.১১ ঃ জাংশনে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগ

(খ) বিপরীত ঝোঁক ঃ যদি বহির্ভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়, যাতে বিভব প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তবে এ ধরনের ঝোঁক প্রয়োগকে বলা হয় বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগ বা বিপরীত বায়াসিং (Reverse biasing)। এক্ষেত্রে ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্ত p-টাইপের প্রান্তের সঙ্গে এবং ধনাত্মক প্রান্ত n-টাইপের প্রান্তের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়। বিপরীত ভোল্টেজ প্রয়োগের জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও প্রাচীরের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র একই দিকে ক্রিয়া করে; ফলে লব্ধি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মান বেড়ে যায়; অর্থাৎ প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। চিত্র–১৪.১২ এ বিপরীত বায়াসিং প্রয়োগ এবং সৃষ্ট বিভব প্রাচীর দেখানো হয়েছে।

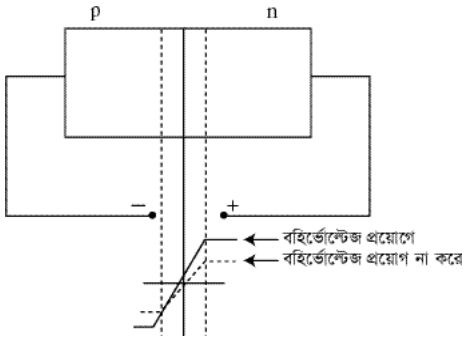

চিত্র–১৪.১২ ঃ জাংশনে বিপরীত বায়াসিং প্রয়োগ

বিভব প্রাচীর বৃদ্ধির ফলে আধান বাহকের চলাচলে আরো অধিক বাধার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ রোধ অনেক বেড়ে যায় ফলে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বহির্ভোল্টেজ প্রয়োগের একটি বিশেষ দিকের জন্য বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং বিপরীত দিকের জন্য প্রবাহ হয় না। জাংশনের এ বিশেষ গুণই বিদ্যুৎ প্রবাহ একমুখীকরণ কাজে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র–১৪.১৩ তে একটি জাংশন ডায়োটের প্রতীক চিহ্ন দেখানো হয়েছে। ডায়োডের p-টাইপ অঞ্চলকে এ্যানোড (anode) এবং n-টাইপ অঞ্চলকে ক্যাথোড (Cathode) বলা হয়। চিত্রে একটি ত্রিভুজ এবং একটি লম্ব রেখা দেখানো হয়েছে। ত্রিভুজ সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে।

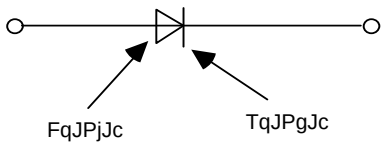

চিত্র ১৪.১৩

৩.২.৪ ঃ p-n জাংশনের বা জাংশন ডায়োডের I-V বৈশিষ্ট্য রেখ

বর্তনী সংযোগ ঃ জাংশন ডায়োডে প্রযুক্ত সম্মুখ এবং বিপরীত ঝোঁকের জন্য জাংশনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের যে পরিবর্তন তাই জাংশনের বৈশিষ্ট্য I-V রেখ। ডায়োড বর্তনীতে ব্যবহারের পূর্বে এর বৈশিষ্ট্য জানা দরকার। চিত্র–১৪.১৪ এ একটি জাংশন ডায়োডকে সম্মুখ ঝোঁক বর্তনীতে সংযুক্ত দেখানো হয়েছে।

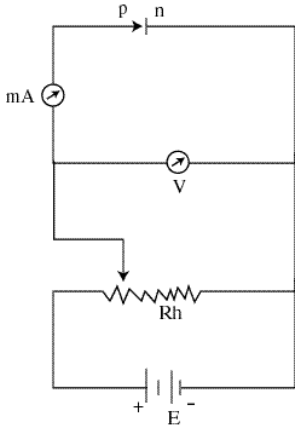

চিত্র–১৪.১৪ ঃ জাংশনে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগের চিত্র

বর্তনীতে একটি ব্যাটারী, একটি পরিবর্তনশীল রোধ (Rheostat), একটি ভোল্টমিটার, একটি অ্যামিটার এবং একটি জাংশন, ডায়োড সংযোগ দেখানো হয়েছে। ডায়োডের দুপ্রান্তে বিভিন্ন মানের ভোল্টেজ প্রয়োগের জন্য পরিবর্তনশীল রোধ ব্যবহার করা হয়েছে। ভোল্টেজ পরিবর্তনের কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য অ্যামিটার এবং জাংশনের প্রান্তদ্বয়ে প্রযুক্ত ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য ভোল্টমিটার সংযোগ দেয়া হয়েছে। অ্যামিটার সবসময় বর্তনীতে শ্রেণী সংযোগ এবং ভোল্টমিটারকে সমান্তরাল সংযোগ দিতে হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ এবার ব্যাটারীর সম্মুখ ভোল্টেজ শূন্য থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করে ভোল্টমিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা হলো। এই বিভিন্ন প্রযুক্ত ভোল্টেজের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের মান এ্যামিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা হলো। ভোল্টেজ V-এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ I এর একটি লেখচিত্র অংকন করা হলো (চিত্র–১৪.১৫)। এরপর ব্যাটারীর সংযোগ পরিবর্তন করে ঋণাত্মক প্রান্ত p-টাইপের প্রান্তের সঙ্গে এবং ধনাত্মক প্রান্ত n-টাইপের প্রান্তের সংযোগ দেয়া হলো। পূর্বের প্রক্রিয়ায় ভোল্টেজ V এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ I পরিমাপ করা হলো। সংগৃহীত উপাত্ত (data) লেখচিত্র–১৪.১৫ এ বসানো হলো।

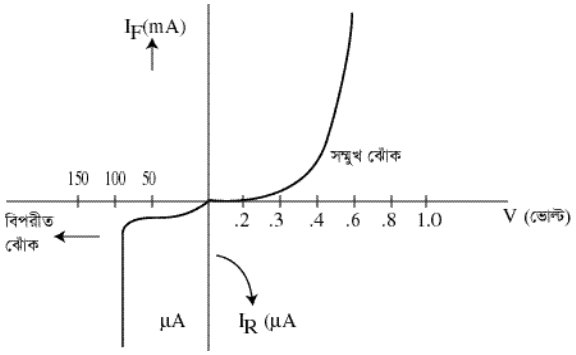

চিত্র–১৪.১৫ ঃ ডায়োডে সম্মুখ ও বিপরীত ঝোঁকের লেখচিত্র।

ফলাফল ঃ V-I বৈশিষ্ট্য চিত্র থেকে সম্মুখ ঝোঁকের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় লক্ষ করা যায়–

(১) সম্মুখ ভোল্টেজ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট বৃদ্ধি পায় না। জার্মেনিয়াম ডায়োডের জন্য 0.3V এবং সিলিকন ডায়োডের জন্য 0.7V পর্যন্ত প্রযুক্ত ভোল্টেজের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট I_F শূন্য থাকে। এরপর কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়। এর কারণ হল যে, ঐ পরিমাণ ভোল্টেজ Vo প্রয়োজন হয় বিভব প্রাচীর বিলুপ্তির জন্য। বিভব প্রাচীর বিলুপ্ত হলে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়।

(২) সম্মুখ ঝোঁক V_F; Vo অপেক্ষা বেশি হলে I_F দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায় I_F খাড়াভাবে উপরে উঠছে। অবশ্য প্রযুক্ত ভোল্টেজের মান অনেক বাড়ালে জাংশনে সৃষ্ট তাপের জন্য জাংশন গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই যে কোন ডায়োড প্রস্তুতকারক কোম্পানি সর্বোচ্চ প্রযুক্ত ভোল্টেজের মান উল্লেখ করে দেয়।

(ক) বিপরীত ঝোঁকের জন্য প্রাপ্ত V-I বৈশিষ্ট্য চিত্র থেকে আমরা পাই– বিপরীত ঝোঁক V_R সামান্য বৃদ্ধির জন্য বিপরীত কারেন্ট I_R বৃদ্ধি পেয়ে দ্রুত Io মানে পৌঁছায়। এরপর বিপরীত ভোল্টেজ বাড়ালেও কারেন্ট Io স্থির থাকে অর্থাৎ কোন পরিবর্তন হয় না। Io কারেন্টকে বিপরীত সম্পৃক্ত কারেন্ট (Reverse saturation current) বা ক্ষরণ কারেন্ট (Leakage current) বলে। আমরা জানি যে, p এবং n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে সংখ্যা লঘু বাহক থাকে, যা বিপরীত বায়াস প্রয়োগ করলে এদের জন্য সম্মুখ বায়াস হিসেবে কাজ করে। ফলে ঐ সমস্ত সংখ্যালঘু বাহকের জন্য সামান্য পরিমাণ কারেন্ট বর্তনীতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এদের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সীমিত এবং নির্দিষ্ট থাকায় এদের প্রবাহের জন্য সৃষ্ট কারেন্টের মান খুব সামান্য হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি স্থির মানে পৌঁছায়। অবশ্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর মানও বৃদ্ধি পাবে। এখন ভোল্টেজ অনেক বাড়ালেও যেহেতু আর অতিরিক্ত কোন বাহকের সৃষ্টি হয় না তাই কারেন্ট স্থির থাকে।

(খ) বিপরীত ঝোঁক বা বায়াস ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে একটি ক্রান্তি মানে পৌঁছালে দেখা যায় যে, বিপরীত কারেন্ট হঠাৎ করে অনেক বেড়ে যায়। এ অবস্থায় মনে করা যেতে পারে যে, p-n জাংশনের রোধ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গেছে। তাই কারেন্ট প্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যে বিশেষ ভোল্টেজের জন্য এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে 'ব্রেকডাউন ভোল্টেজ

(breakdown voltage) বা জেনার ভোল্টেজ (Zener voltage) বলে। ব্রেকডাউন ভোল্টেজে পৌঁছালে বাইরের রোধ নিয়ন্ত্রণ করে কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ না করলে প্রায়ই ডায়োড নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক প্রস্তুতকারী কোম্পানি তাদের এ ভোল্টেজের পরিমাণ উল্লেখ করে দেয় যাতে প্রযুক্ত ভোল্টেজের মান তার বেশি না হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। জাংশন ডায়োড কি?

২। ডিপ্লিশন স্তর কি?

৩। সম্মুখ ঝোঁকে ডিপ্লিশন স্তরের কি পরিবর্তন হয়?

৪। ডায়োডে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না কেন?

৫। ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ কি?

৬। সম্মুখ ঝোঁকের পরিমাণ খুব বেশি বাড়ালে কি হয়?

৭। বিপরীত সম্পৃক্ত কারেন্ট কি?

পাঠ ৩ একমুখীকরণ বর্তনী ও রেকটিফায়ারের সাহায্যে একমুখীকরণ ব্যাখ্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- একমুখীকরণ কি বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেকটিফায়ার কি বলতে পারবেন;
- একমুখীকরণের বর্তনীচিত্র অংকন করতে পারবেন;
- বর্তনীর বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেকটিফায়ারের ইনপুট ও আউটপুট রেখ অংকন করতে পারবেন;
- রেকটিফায়ার কত প্রকারের এবং প্রত্যেকটির কার্যপ্রণালী বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পূর্ণচক্র রেকটিফায়ারের একাধিক বর্তনীচিত্র অংকন করতে পারবেন;
- রেকটিফায়ারের ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

যে পদ্ধতিতে পরিবর্তী প্রবাহকে (A.C) একমুখী (D.C) প্রবাহে পরিবর্তন করে তাকে একমুখীকরণ বা রেকটিফিকেশন (Rectification) বলে এবং যে বর্তনীর সাহায্যে এ ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় তাকে বলা হয় একমুখীকারক বা রেকটিফায়ার (Rectifier)। পরিবর্তী প্রবাহ বলতে আমরা কি বুঝি জানা দরকার। যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের অভিমুখ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সমমুখী হয় এবং পরিবর্তনের ধারাটি যদি একই রকমের হয়, সাধারণত: একটি সাইন তরঙ্গ (sine wave) বা কস তরঙ্গ (cos wave) হয়, তবে ঐ প্রবাহকে পরিবর্তী প্রবাহ বলে (চিত্র–১৪.১৬)।

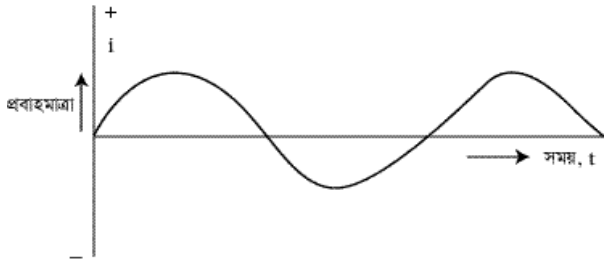

চিত্র–১৪.১৬

আমরা এর আগের পাঠ থেকে জেনেছি যে ডায়োড একটি বিশেষ অভিমুখে বা দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে কিন্তু বিপরীত দিকে কোন উল্লেখযোগ্য প্রবাহ পাওয়া যায় না। জাংশন ডায়োডের এ বিশেষ ধর্মকে একমুখীকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। একমুখীকারক দু'প্রকারের। যথা– (ক) অর্ধতরঙ্গ একমুখীকারক এবং (খ) পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকারক। নিম্নে আমরা উভয় ধরনের একমুখীকারক আলোচনা করবো।

৩.৩.১ ঃ অর্ধতরঙ্গ একমুখীকারক (Half wave rectifier)

চিত্র–১৪.১৭ এ একটি অর্ধপরিবাহী ডায়োডের সাহায্যে অর্ধতরঙ্গ একমুখীকারক বর্তনী দেখানো হয়েছে। এ বর্তনীতে একটি ডায়োড, একটি ইনপুটে পরিবর্তী প্রবাহের উৎস ও একটি রোধ দেখানো হয়েছে।

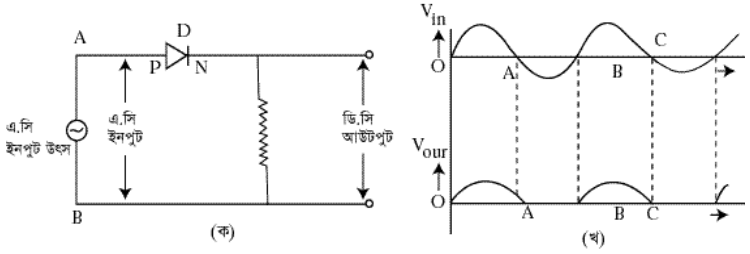

চিত্র–১৪.১৭ এর (ক) ও (খ) অংশে ডায়োডে প্রযুক্ত ইনপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুটে প্রাপ্ত ডি.সি ভোল্টেজ চিত্র দেখানো হয়েছে।

কার্যপ্রণালী ঃ

এ.সি ইনপুটের তরঙ্গের প্রথম অর্ধচক্র OA (১৪.১৭-ক) প্রবাহের সময় A বিন্দু ধনাত্মক বিভবযুক্ত এবং B বিন্দু ঋণাত্মক হয় ফলে তরঙ্গের ডায়োড D সম্মুখ ঝোঁক প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থায় ডায়োডের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে এবং আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যায়। কিন্তু ইনপুটের তরঙ্গ দ্বিতীয় অর্ধচক্র AB (চিত্র–১৪.১৭ ক) এর জন্য A বিন্দু ঋণ এবং B বিন্দু ধনাত্মক বিভবযুক্ত হয় অর্থাৎ ডায়োড D তরঙ্গের বিপরীত ঝোঁক প্রাপ্ত হয়। তখন ডায়োডের মধ্যদিয়ে কোন প্রবাহ চলে না ফলে আউটপুটে কোন ভোল্টেজ পাওয়া যায় না (চিত্র– ১৪.১৭-খ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র এসি ইনপুটের এক অর্ধচক্রের জন্য প্রবাহ চলে। যদি ডায়োডের সংযোগ বিপরীতমুখী করা হয় অর্থাৎ লম্বরেখা উৎসের A প্রান্তের সঙ্গে এবং ত্রিভুজ B প্রান্তে সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়, তবে ডায়োড AB অর্ধচক্রের সময় আউটপুট পাওয়া যাবে; কিন্তু OA অর্ধচক্রের জন্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না।

এ প্রক্রিয়া অর্থাৎ এক অর্ধচক্রের জন্য আউটপুট পাওয়া এবং অপর অর্ধচক্রের জন্য আউটপুট না পাওয়ার জন্যই একে অর্ধচক্র একমুখীকরণ বলে।

(খ) পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারক (Full-wave Rectifier)

চিত্র–১৪.১৭ এ একটি মাত্র ডায়োট ব্যবহার করা হয়েছে। এবার যদি A এবং B উভয় প্রান্তের সঙ্গে দু'টি স্বতন্ত্র ডায়োড সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তবে এসি ইনপুটের বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য আউটপুটে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাবে।

এ অবস্থায় বর্তনী পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকারক হিসেবে কাজ করে। চিত্র–১৪.১৮ এ একটি বর্তনী চিত্র এবং চিত্র–১৪.১৯ এ ইনপুট ও আউটপুট প্রবাহ দেখানো হয়েছে।

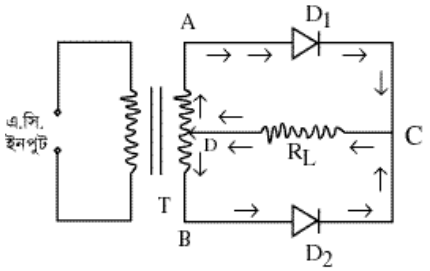

চিত্র–১৪.১৮ ঃ বর্তনী

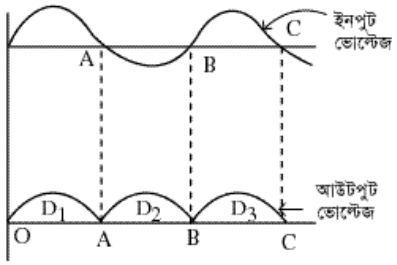

চিত্র–১৪.১৯ ঃ ইনপুট সিগন্যাল ও আউটপুট সিগন্যাল

কার্যপ্রণালী

এসি ইনপুটের তরঙ্গের ধনাত্মক অর্ধাংশের (চিত্র ১৪.১৮ এর OAঅংশ) জন্য ট্রান্সফরমারের আউটপুটের A প্রান্ত ধনাত্মক এবং B প্রান্ত ঋণাত্মক বিভবযুক্ত হয়। এ অবস্থায় ডায়োড D_1 সম্মুখ ঝোঁক এবং ডায়োড D_2 বিপরীত ঝোঁক প্রাপ্ত হয়। ফলে ডায়োড D_1 এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে; কিন্তু D_2 এর ভিতর দিয়ে কোন প্রবাহ চলে না। বাইরের ভার (Load) R_L এর ভিতর দিয়ে C বিন্দু থেকে D বিন্দুর দিকে প্রবাহ চলবে।

এবার ইনপুটের বিপরীত অর্ধাংশ (AB) এর জন্য ট্রান্সফরমারের আউটপুটের A প্রান্ত ঋণাত্মক এবং B প্রান্ত ধনাত্মক বিভবযুক্ত হয়। ফলে ডায়োড D_1 নিশ্চুপ থাকে এবং ডায়োড D_2 এর মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে (চিত্র ১৪.১৯খ)। এক্ষেত্রে বাইরের ভার (load) R_L এর ভিতর দিয়ে C বিন্দু থেকে D বিন্দুর দিকে প্রবাহ চলে। সুতরাং উভয় ডায়োডের জন্য বাইরের ভারে বিদ্যুৎ প্রবাহ একই দিকে হয়। অনুরূপভাবে ইনপুটের পরবর্তী চক্রের ক্ষেত্রে প্রথম অর্ধাংশের জন্য ডায়োড D_1 এবং পরবর্তী অর্ধাংশের জন্য ডায়োড D_2 এর ভিতর দিয়ে প্রবাহ চলে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকরণ প্রক্রিয়ায় ইনপুট চক্রের পূর্ণ অংশের জন্য আউটপুট ভোল্টেজ একই দিকে পাওয়া যায়; এজন্য একে পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকরণ প্রক্রিয়া এবং সম্পূর্ণ ব্যবস্থা (system) কে পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকারক বলে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অর্ধতরঙ্গ বা পূর্ণতরঙ্গ একমুখী কারকের কোনটির আউটপুটেই বিশুদ্ধ একমুখী আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যায় না। যে আউটপুট পাওয়া যায়, তাকে বলে পালসেটিং (Pulsating) একমুখীপ্রবাহ। বিশুদ্ধ প্রবাহ পেতে হলে এ আউটপুটকে ফিল্টার বর্তনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ করতে হবে।

৩.৩.২ ঃ বিশেষ ধরনের কিছু ডায়োড

এখন আমরা বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি ডায়োড সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(ক) LED বা লেড (Light Emitting Diode, LED)

লেড্ হলো লাইট এমিটিং ডায়োডের সংক্ষিপ্ত নাম। এ ডায়োডের ভিতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন এর ভিতর থেকে আলো নির্গত হয়। এজন্যই এর নামকরণ করা হয়েছে লাইট এমিটিং ডায়োড। বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণের সঙ্গে আলোর তীব্রতা কম বেশি হয়। বিভিন্ন অডিও সিস্টেম, যেমন- রেডিও, টেপরেকর্ডার, এ্যামপ্লিফায়ার, টেলিভিশন ইত্যাদিতে LED-এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক মিটার, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ইত্যাদিতে সংখ্যা ফুটিয়ে তোলার কাজে লেড্ ব্যবহার করা হয়।

গঠন ঃ চিত্র–১৪.২০ এ একটি LED এর প্রতীক চিহ্ন এবং চিত্র ১৪.২১ এ গঠন ও বর্তনী চিত্র দেখানো হয়েছে।

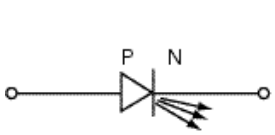

চিত্র: ১৪.২০ প্রতীক চিহ্ন

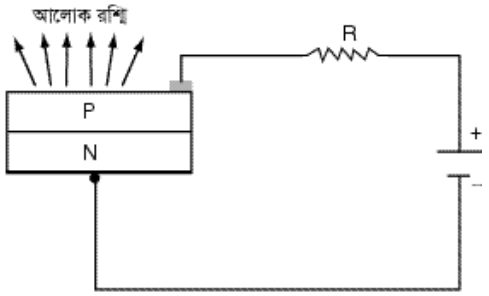

চিত্র: ১৪.২১ গঠন ও বর্তনী চিত্র

চিত্র–১৪.২১ এ একটি LED এর PN জাংশন দেখানো হয়েছে। N-স্তরের নিচের পৃষ্ঠ সম্পূর্ণটাই ধাতব স্পর্শযুক্ত। এটা ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্ত হিসেবে কাজ করে এবং ভিতরের অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে P অংশের দিকে যায়। P স্তরের সামান্য অংশ বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ধাতব সম্পর্কযুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট বিরাট অংশ গ্লাস বা অন্য কোন স্বচ্ছ মাধ্যম দ্বারা ঢাকা থাকে যাতে P অর্ধপরিবাহীর ওপর ময়লা জমতে না পারে এবং বাইরের কোন কিছুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ঢাকনার ভিতর দিয়ে আলো সহজে বাইরে চলে আসতে পারে।

কার্যপ্রণালী ঃ LED মূলত: অন্যান্য ডায়োডের মত একটি সরল PN জাংশন ডায়োড। এটিও সম্মুখ ঝোঁকে কাজ করে। তবে সাধারণ ডায়োড যেমন সিলিকন বা জার্মেনিয়াম অর্ধপরিবাহী কেলাস থেকে তৈরি, LED তৈরি করা হয় গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ফসফাইড (GaAsP), গ্যালিয়াম ফসফাইড (GaP) বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) অর্ধপরিবাহী পদার্থ দ্বারা। আমরা জানি যে, যখন ডায়োড সম্মুখ ঝোঁক প্রাপ্ত হয়, তখন P অঞ্চল থেকে হোল এবং N অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন দ্রুত জাংশনের দিকে ধাবিত হয় এবং একসঙ্গে মিলিত হয়। সিলিকন বা জার্মেনিয়াম ডায়োডে ইলেকট্রন ও হোলের মিলনের ফলে নিসৃত শক্তি তাপ হিসেবে প্রকাশ পায়। ফলে এ সমস্ত ডায়োড উত্তপ্ত হয়। কিন্তু LED তৈরির জন্য উপরোল্লিখিত পদার্থে ইলেকট্রন হোলের মিলনে নিঃসৃত শক্তি তাপ হিসেবে বের না হয়ে আলোক রশ্মি হিসেবে বের হয়ে আসে। সুতরাং চিত্র–১৪.২১ এ PN জাংশনে ইলেকট্রন হোলের মিলনক্রিয়ায় সৃষ্ট আলোক শক্তি P অংশের স্বচ্ছ অঞ্চল দিয়ে ডায়োড থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবেই LED কাজ করে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, LED ব্যবহার করে আমরা ক্যালকুলেটর বা বিভিন্ন সংখ্যা প্রদর্শনযন্ত্রে দেখে থাকি। LED এর সাহায্যে আমরা কিভাবে সংখ্যা দেখতে পাই তা চিত্র–১৪.২২ এ দেখানো হলো। 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা আলোকিত করার জন্য মোট ৭টি LED এর প্রয়োজন হয়।

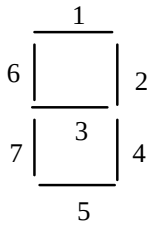

চিত্র–১৪.২২

মনে করা যাক '6' সংখ্যাকে আলোকিত করতে হবে। এক্ষেত্রে 1, 6, 7, 5, 4 ও 3 নং ডায়োডে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগ করলে সংখ্যা '6' পাওয়া যাবে। আবার '5' সংখ্যা পাওয়ার জন্য 1, 6, 3, 4 ও 5 ডায়োডে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগ করে আমরা '5' সংখ্যাটি পাব। এভাবে '8' সংখ্যাটির জন্য সবকটি LED-এ সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন রং-এর আলোক রশ্মি পাওয়ার জন্য LED তৈরিতে বিভিন্ন অর্ধপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

(খ) সৌর কোষ বা সোলার সেল (Solar Cell)

সৌর কোষ হলো এমন এক ধরনের কোষ যা সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। তাই একে সৌরশক্তি রূপান্তরক বলা হয়। মূলত: এটিও একটি PN জাংশন ডিভাইস বা যন্ত্র।

গঠন ঃ চিত্র– ১৪.২৩ এ একটি সৌরকোষের গঠন ও বর্তনী দেখানো হয়েছে।

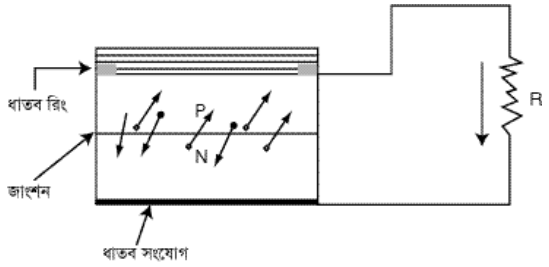

চিত্র–১৪.২৩

এটি একটি সিলিকন PN জাংশন। এর ওপরের পৃষ্ঠে গ্লাস বা প্লাস্টিকের তৈরি একটি স্বচ্ছ জানালা থাকে। যার মধ্যদিয়ে আলোক রশ্মি সহজে প্রবেশ করতে পারে। সাধারণ ডায়োডে P এবং N স্তর একই বেধের (Thickness) হয়। এক্ষেত্রে P-টাইপ স্তর N টাইপের তুলনায় খুবই পাতলা হয়। এতে সুবিধা হল এই যে, আলোকরশ্মি সহজে কম দূরত্ব অতিক্রম করে PN জাংশনে পৌঁছতে পারে। P স্তরের ওপরের অংশের উভয়পার্শ্বে বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য দু'টি ধাতব রিং থাকে। N-স্তরের নিচের অংশ পুরোটাই ধাতব সংযুক্ত থাকে। এখান থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ

সূর্যালোক থেকে আপতিত আলোকরশ্মি স্বচ্ছ জানালার ভিতর দিয়ে ডায়োডে প্রবেশ করে। ভ্যালেন্স বা যোজন ইলেকট্রনের সঙ্গে আপতিত আলোক শক্তির সংঘর্ষের ফলে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন যথেষ্ট শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং মূল পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবে জাংশনের উভয়পার্শ্বে যথেষ্ট পরিমাণ মুক্ত ইলেকট্রন ও হোলের সৃষ্টি হয় এবং এদের প্রবাহ সংখ্যালঘু বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। আলোক শক্তির পরিমাণ এবং আলোকিত অঞ্চলের ব্যাপ্তির ওপর বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে। এভাবে PN জাংশনের একপ্রান্ত কোষের ধনাত্মক ও অপর প্রান্ত ঋনাত্মক হয়।

সৌরকোষ আলোক গ্রহণ যন্ত্রে (optical fibre instrument), কৃত্রিম উপগ্রহ, ঘরবাড়ি আলোকিত করাসহ অন্যান্য বহু কাজে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তি বহুভাবে পরিবেশ দূষণ করে; তাছাড়া কয়লা, তৈল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত শক্তির উৎস ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে আসছে। সৌরকোষ পরিবেশ দূষণ করে না এবং এর উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রচুর। সুতরাং আগামী দিনের শক্তির উৎস হিসেবে সৌরকোষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। রেকটিফায়ার কি এবং কয় ধরনের?

২। রেকটিফায়ারের আউটপুটে কি বিশুদ্ধ একমুখী ভোল্টেজ পাওয়া যায়?

৩। রেকটিফায়ার কি কাজে লাগে?

৪। LED কি?

৫। সিলিকন বা জার্মেনিয়াম অর্ধপরিবাহী দিয়ে LED তৈরি করা যায় কি?

৬। LED এবং সাধারণ ডায়োডের পার্থক্য কি?

৭। LED থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন আলোক রশ্মির রং এর ভিন্নতার কারণ কি?

৮। সৌরকোষ কি?

৯। সৌরকোষের উপরের পৃষ্ঠে স্বচ্ছ জানালা ব্যবহার করা হয় কেন?

১০। সৌরকোষ কি কাজে ব্যবহার হয়?

পাঠ ৪ n-p-n ও p-n-p ট্রানজিস্টর, FET ও এ্যামপ্লিফায়ার বর্তনী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ট্রানজিস্টার কি বলতে পারবেন;
- ট্রানজিস্টার কত প্রকার ও কি কি বলতে পারবেন;
- n-p-n ও p-n-p ট্রানজিস্টারের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ট্রানজিস্টারের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ট্রানজিস্টারের গঠন প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ট্রানজিস্টারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ট্রানজিস্টারের কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টরের রাশিমালা লিখতে পারবেন;
- বর্তনীচিত্র অংকন করতে পারবেন;
- এ্যামপ্লিফায়ারের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- FET কি বলতে পারবেন;
- FET এর গঠন প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন;
- FET এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ

ট্রানজিস্টর হলো তিন প্রান্ত (terminal) বিশিষ্ট একটি ডিভাইস (Device)। ১৯৪৮ সালে আমেরিকায় বেল ল্যাবরেটরীতে (Bell Laboratory) প্রথম এর আবিষ্কার হয়। আবিষ্কারের পর থেকেই ট্রানজিস্টার ইলেকট্রনিক জগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবর্ধক (Amplifier) হিসেবে এর ব্যবহার সর্বাধিক। সাধারণ ট্রানজিস্টারে ইলেকট্রন এবং হোল উভয় ধরনের চার্জ বাহক (Charge carrier) থাকে বলে একে বাইপোলার ট্রানজিস্টার বলে।

FET এক ধরনের ট্রানজিস্টার যার মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি শুধুমাত্র সংখ্যাগুরু বাহক দ্বারা পরিচালিত হয়।

৩.৪.১ ঃ ট্রানজিস্টর বা অর্ধপরিবাহী ট্রায়োড ঃ

একটি ডায়োডে আমরা জানি, দুটো টার্মিনাল থাকে, ট্রানজিস্টারে তিনটি টার্মিনাল থাকে। একটিকে বলা হয় এমিটার, দ্বিতীয়টি বেস এবং তৃতীয়টি কালেক্টর। চিত্র–১৪.২৪ এ ব্লক চিত্র ও প্রতীক চিহ্ন দিয়ে একটি ট্রানজিস্টর দেখানো হয়েছে।

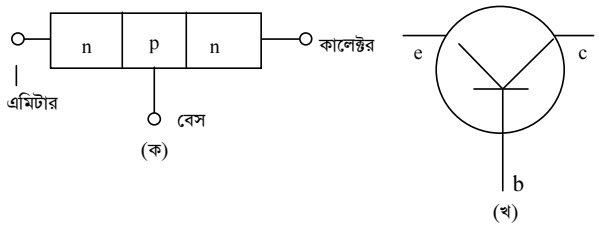

চিত্র–১৪.২৪ (ক) ব্লক চিত্র (খ) প্রতীক চিহ্ন।

গঠন ঃ

সাধারণত: পয়েন্ট কন্টাক্ট (Point contact) এবং জাংশন তৈরি পদ্ধতিতে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। তবে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত ট্রানজিস্টরের বেশির ভাগই জাংশন ট্রানজিস্টর। জাংশন পদ্ধতিতে ট্রানজিস্টর তৈরি করার জন্য একখণ্ড খুবই উন্নতমানের অতিবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কেলাস নেয়া হয়। উচ্চতাপে এর মধ্যে n বা p টাইপ অপদ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। এর উপরে একই প্রক্রিয়ায় p বা n টাইপ অপদ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। এর উপরে n বা p এর আরও একটি স্তর স্থাপন করা হয়। এভাবে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়।

ট্রানজিস্টর দু'ধরনের। যথা– n-p-n এবং এ p-n-p। বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুটি p-n জাংশন পাশাপাশি সংযোগ করলে n-p-n বা p-n-p ট্রানজিস্টর পাওয়া যায়। অবশ্য সংযোগ সোল্ডারিং (Soldering) বা কোন কিছু দিয়ে যুক্ত করা সম্ভব নয়। গঠন অংশে বর্ণিত পদ্ধতিতে এ সংযোগ স্থাপন করা হয়। চিত্র–১৪.২৫ এ দু'ধরনের ট্রানজিস্টার প্রতীক চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

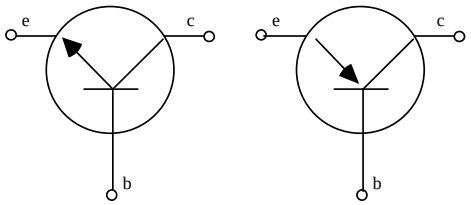

চিত্র–১৪.২৫

দুটি n টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝখানে একটি p টাইপ অথবা দুটি p টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝখানে একটি n টাইপ অর্ধপরিবাহী বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্থাপন করে আমরা n-p-n বা p-n-p ট্রানজিস্টর পেতে পারি।

ট্রানজিস্টরের মাঝের অংশকে বলা হয় বেইস (base)। এর পুরুত্ব বা বেধ খুব পাতলা করা হয় এবং ডোপিং ঘনত্বও খুব হালকা করা হয়। এর কারণ হলো এমিটার থেকে ইলেকট্রন বা হোল বেসের মধ্যদিয়ে কালেক্টর অঞ্চলে যাওয়ার সময় যাতে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় এবং কমসংখ্যক বিপরীতধর্মী চার্জ বাহকের সংস্পর্শে আসে। নচেৎ ইলেকট্রন হোল মিলিত হয়ে নিষ্ক্রিয় পরমাণু গঠিত হয়। এমিটার অংশ বেশ পুরু এবং অধিক পরিমাণে অপদ্রব্য মিশ্রণ করা হয় যাতে অধিক পরিমাণ বাহক চার্জ কালেক্টরে প্রবাহিত হতে পারে। কালেক্টর অংশে বেশি পরিমাণে অপদ্রব্য মিশ্রিত করা হয় এবং এমিটারের তুলনায় বেশি পূরু করা হয়। কেননা এ অংশে প্রবাহের জন্য সৃষ্ট তাপ যাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে তাই একে পুরু করা হয়।

ট্রানজিস্টর বায়াসিং

ট্রানজিস্টরে দুটি জাংশন থাকে। যথা এমিটার-বেস জাংশন এবং বেস-কালেক্টর জাংশন। এমিটার-বেস জাংশনে সম্মুখ ঝোঁক প্রদান করা হয় এবং কালেক্টর বেস জাংশনে বিপরীত ঝোঁক প্রদান করা হয়। ফলে ইলেকট্রন বা হোল এমিটার থেকে কালেক্টর-এর দিকে প্রবাহিত হয়। সম্মুখ বায়াস যুক্ত জাংশনের রোধ বিপরীত বায়াসযুক্ত জাংশনের তুলনায় খুবই নগণ্য। দুর্বল সিগন্যাল (Signal) বা সংকেতকে কম রোধ বিশিষ্ট জাংশনে প্রয়োগ করা হয় এবং উচ্চ রোধ বিশিষ্ট জাংশন থেকে আউটপুট নেয়া হয়। চিত্র–১৪.২৬ এ বায়াসিং পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

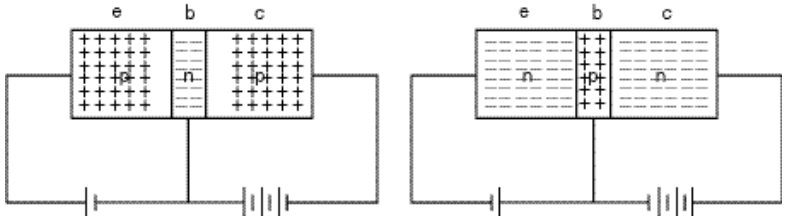

চিত্র–১৪.২৬ ঃ p-n-p এবং n-p-n ট্রানজিস্টারের বায়াসিং

একটি ট্রানজিস্টর সিগন্যালকে স্পত্মরোধ থেকে উচ্চরোধে ট্রান্সফার (Transfer) করে। রোধের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ ট্রান্সফার করে বলে একে ট্রান্সফার রেজিস্টর (Transfer resitor) সংক্ষেপে ট্রানজিস্টর (Transistor) নামকরণ করা হয়েছে।

কার্যপ্রণালী ঃ ট্রানজিস্টর দু'ধরনের, এখানে শুধু একটি n-p-n ট্রানজিস্টরের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করা হবে। এ থেকে p-n-p ট্রানজিস্টরের কার্যপ্রণালী বুঝতে অসুবিধা হবে না। চিত্র ১৪.২৬ (খ) এ- n-p-h ট্রানজিস্টরের বর্তনী সংযোগ দেখানো হয়েছে। বামদিকের এমিটার বেস জাংশনকে সম্মুখ ঝোঁকে এবং ডানদিকের বেস কালেক্টর জাংশনকে বিপরীত ঝোঁকে রাখা হয়েছে। এমিটার বেস জাংশন সম্মুখ ঝোঁকে থাকায় p অঞ্চল n অঞ্চলের তুলনায় ধনাত্মক হয়, ফলে n অঞ্চল থেকে ইলেকট্রনগুলো সহজেই p অঞ্চলে চলে আসতে পারে। আবার জাংশন বেস কালেক্টর বিপরীত ঝোঁকে থাকায় কালেক্টর অঞ্চল বেস কালেক্টর বেশি ধনাত্মক হয়। এর ফলে এমিটার থেকে বেসে প্রবাহিত ইলেকট্রনগুলো তীব্রভাবে কালেক্টরের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং n-অঞ্চল ইলেকট্রন গ্রহণ করে। অবশ্য বেসের ভিতর দিয়ে আসার সময় কিছুসংখ্যক ইলেকট্রন

বেসের হোল পূরণ করে। কিন্তু বেস খুব পাতলা এবং হাল্কা পরিমাণে ডোপড (Doped) থাকায় খুব সামান্য পরিমাণ ইলেকট্রন হোল পূরণ করে। এমিটার থেকে প্রবাহিত ইলেকট্রনের ৯৫% এর বেশি ইলেকট্রন কালেক্টর অঞ্চলে পৌঁছে। এভাবে ট্রানজিস্টরে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

p-n-p ট্রানজিস্টরকে বায়াসিং ভিন্নভাবে করা হয় (চিত্র ১৪.২৬-ক দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে হোল এমিটার থেকে বেসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কালেক্টর বেশি ঋণাত্মক থাকায় হোলসমূহ বেস থেকে তীব্রভাবে কালেক্টরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং তা বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে।

৩.৪.২ ঃ ট্রানজিস্টরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Transistor)

প্রত্যেক ট্রানজিস্টর প্রস্তুতকারী কোম্পানি ট্রানজিস্টরের ডাটা সীট সরবরাহ করে। এতে ঐ মডেলের ট্রানজিস্টরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়। বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো–

(i) কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টর (Current gain factor), α।

(ii) কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টর β।

(iii) ইনপুট রোধ (Input resistance) r_{in} ।

(iv) আউটপুট রোধ (Output resistance) r_{out}

(v) লিকেজ কারেন্ট বা ক্ষরণপ্রবাহ (leakage current)।

(vi) কারেন্ট ও ভোল্টেজের সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রা (maximum permissible limit)।

(vii) সর্বোচ্চ ক্ষমতা অবক্ষয় (Maximum power dissipation)।

নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

(i) কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টর (Current gain factor) α ঃ ট্রানজিস্টার হচ্ছে এক ধরনের কারেন্ট নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস। কারেন্ট এমিটার থেকে বেসের মধ্যদিয়ে কালেক্টরে প্রবাহিত হয়। কালেক্টর থেকে আউটপুট কারেন্ট সংগ্রহ করা হয় বলে একে আউটপুট কারেন্ট (I_{out}) বা L_6 এবং এমিটারের কারেন্টকে ইনপুট কারেন্ট (I_{in}) বা I_2 বলা হয়। ট্রানজিস্টরের কারেন্ট গেইনফ্যাক্টর বলতে এ দুয়ের অনুপাত বুঝায়। অর্থাৎ

$$\alpha = \left(\frac{I_{out}}{I_{in}}\right)_{VcB} \text{------ (i)} = \frac{Ii}{Ie} \text{ --------- (i)}$$

এক্ষেত্রে কালেক্টর ভোল্টেজ স্থির রাখা হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, এমিটার কারেন্ট বেসের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বেসের হোল বা ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কালেক্টরে প্রবাহিত হয়। সুতরাং এ অপচয়ের কারণে কালেক্টর কারেন্ট সব সময়ই এমিটার কারেন্টের চেয়ে কম মানের হয়। অর্থাৎ $I_{out} < I_{in}$ ।

বা, $\frac{I_{out}}{I_{in}} < 1$ বা, $\alpha < 1$ ।

অতএব, সাধারণ বা বাইপোলার ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে α এর মান 1 এর কম হয়। সাধারণত α এর মান 0.95 থেকে 0.998 পর্যন্ত হয়।

ট্রানজিস্টর বর্তনীর ভোল্টেজ গেইন হবে।

$$\text{ভোল্টেজ গেইন} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$= \frac{I_{out} * R_{out}}{I_{in} * R_{in}}$$

$$= \alpha \times \frac{R_{out}}{R_{in}} \text{ ------- (2)}$$

এখানে R_{out} হচ্ছে কালেক্টর বেস বর্তনীর রোধ এবং R_{in} হচ্ছে এমিটার বেস বর্তনীর রোধ। R_{out} এর মান R_{in} এর চেয়ে অনেক গুণ বড় হয় বলে ভোল্টেজ গেইন কয়েকগুণ থেকে কয়েকশ' গুণ হতে পারে। এখন, কারেন্ট গেইন ও ভোল্টেজ গেইন থেকে ট্রানজিস্টরের পাওয়ার (Power) গেইন এর রাশিমালা বের করতে পারি।

পাওয়ার গেইন = $\frac{\text{আউটপুট পাওয়ার}}{\text{ইনপুট পাওয়ার}}$ ।

বা, পাওয়ার গেইন = $\frac{I^2_{out} * R_{out}}{I^2_{in} * R_{in}} = \alpha^2 \times \frac{R_{out}}{R_{in}}$ ---- (3)

(ii) কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টর β

পূর্বে বলা হয়েছে যে, এমিটার কারেন্টের সম্পূর্ণ অংশ কালেক্টরে যেতে পারে না। সামান্য অংশে বেস কারেন্ট হিসেবে প্রবাহিত হয়। এখন বেস কারেন্টের সামান্য পরিবর্তনের জন্য কালেক্টর কারেন্টের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাতকে β হিসেবে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ

$$\beta = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right)_{VcE} \text{ ------ (4)}$$

এখানে, ΔI_C কালেক্টর কারেন্টের পরিবর্তন।

ΔI_B বেস কারেন্টের পরিবর্তন।

যেহেতু বেসে প্রবাহিত কারেন্টের তুলনায় কালেক্টরে অনেকগুণ বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয়, সুতরাং β এর মান অনেকগুণ হয়। β সাধারণত ২০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

α এবং β এর সম্পর্ক হলো নিম্নরূপ–

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

---------- (5)

বা, $\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$

$\because I_E = I_B + I_c$

$I_B = I_E - Ic$

$$\beta = \frac{\Delta Ic}{\Delta I_B} = \frac{Ic}{I_B} = \frac{Ic}{I_E - Ic} = \frac{Io/I_E}{\frac{Io}{I_E} - \frac{Ic}{I_E}}$$

$$= \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

(iii) সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমা ঃ

ট্রানজিস্টরের মধ্যদিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে, কিংবা অধিক পরিমাণ ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে ট্রানজিস্টরের ক্ষতি হতে পারে বা পুড়ে যেতে পারে। তাই প্রস্তুতকারীরা সর্বোচ্চ পরিমাণ কারেন্ট এবং ভোল্টেজ উল্লেখ করে থাকে। এর বেশি কারেন্টের প্রবাহ বা ভোল্টেজ কোনমতেই উচিত নয়। এ সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবাহমাত্রা বা সর্বোচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগের সীমাকে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমা বলা হয়।

৩.৪.৩ ঃ FET বা ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর (Field Effect Transistor)

n-p-n বা p-n-p ট্রানজিস্টর হচ্ছে বাইপোলার (Bipolar) ট্রানজিস্টর। এ সমস্ত ট্রানজিস্টরে ইলেকট্রন এবং হোল উভয় ধরনের চার্জবাহক (Charge carrier) থাকে এবং উভয়েই পরিবান প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এজন্য এদেরকে বাইপোলার ট্রানজিস্টর বলে। যার সংখ্যা অনেক বেশি সেটি সংখ্যাগুরু এবং যার সংখ্যা কম তাকে সংখ্যলঘু বাহক বলে। বাইপোলার ট্রানজিস্টরের দুটো প্রধান অসুবিধা রয়েছে। যেমন–

(i) সম্মুখ বায়াসিং এ এর এমিটার বেস জাংশনের রোধ খুবই কম।

(ii) এ ধরনের ট্রানজিস্টরের অঙ্গাস্বর প্রাবল্য স্তর (Noise level) বেশ বেশি।

উপরের দু'টো অসুবিধাই এক ধরনের ট্রানজিস্টরের সাহায্যে দূরীভূত হয়। এদেরকে বলা হয় FET বা ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর।

ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর বা FET 'তিন প্রান্ত' (three terminal) বিশিষ্ট একধরনের সলিড স্টেট ডিভাইস। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে এ ডিভাইসের ভিতর প্রবাহিত কারেন্ট পরিবর্তন করা হয় বলে একে ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর বা FET বলে। যেহেতু সংখ্যাগুরু বাহক দ্বারা কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাই একে একধ্রুবী (Unipolar) ডিভাইসও বলা হয়।

শ্রেণীভেদ ঃ FET মূলতঃ দু'ধরনের। যথা– (ক) জাংশন ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর, JFET (Junction Field Effect Transistor) এবং (খ) ইনসুলেটেড গেট ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর, IGFET (Insulated Gate, Field Effect Transistor)

মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) বা সংক্ষেপে MOSFET / IGFET হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত।

গঠন ঃ

FET কে গঠন অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা (i) n-চ্যানেল FET ও (ii) p-চ্যানেল FET। নিম্নে একটি n চ্যানেল FET এর গঠন প্রণালী বর্ণনা করা হলো।

n-চ্যানেল FET তৈরির জন্য একটি n-টাইপ সিলিকন অর্ধপরিবাহী দন্ড (bar) নেয়া হয়। এর উভয় প্রান্তে দুটি ধাতব সংযোগ দেয়া হয় (চিত্র–১৪.২৭)। এটিকে বলা হয় উৎস (Source) S এবং অন্যটিকে বলা হয় ড্রেন (Drain) D।

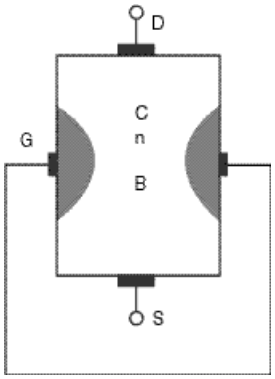

চিত্র–১৪.২৭

সিলিকন দন্ডের উভয় পার্শ্বে কিছু অংশ p টাইপ অপদ্রব্য দ্বারা সমভাবে ডোপ্‌ড করা হয়। ফলে দু'পার্শ্বে দুটি pn জাংশন তৈরি হয়। p-টাইপ স্তরদ্বয়কে বলা হয় গেট (gate)। এ স্তরদ্বয় অন্তস্থভাবে সংযুক্ত থাকে। স্তরদুটির মধ্যবর্তী অঞ্চল BC কে বলা হয় চ্যানেল। এ চ্যানেলের মধ্যদিয়ে চার্জবাহক (charge carruier) চলাচল করে। চিত্র–২৩ এ যেহেতু চ্যানেলটি n-টাইপ তাই এর নামকরণ হয়েছে n-চ্যানেল FET। যদি চ্যানেল p টাইপ হয় তবে একে p-চ্যানেল FET বলা হয়। p-টাইপ চ্যানেলের ক্ষেত্রে চ্যানেলের উভয়পার্শ্বে কিছু অংশে n-টাইপ স্তর তৈরি করা হয়। গেট G, হলো FET এর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী টার্মিনাল বা প্রান্ত। FET এর ড্রেন এবং উৎসকে পরিবর্তন করে D কে S এবং S কে D করা যায়। S এবং G এর মধ্যে সবসময় বিপরীত বায়াস প্রয়োগ করা হয়। চিত্র–১৪.২৮-এ বিভিন্ন অংশের বর্তনী সংযোগ এবং চিত্র–১৪.২৯ এ JFET এর প্রতীক চিহ্ন দেখানো হয়েছে।

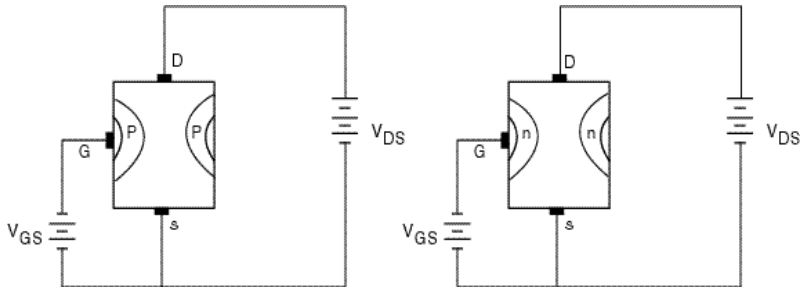

(ক) n-চ্যানেল (খ) p-চ্যানেল

চিত্র–১৪.২৮। (ক) n-চ্যানেল JFET এর বর্তনী চিত্র (খ) p-চ্যানেলের বর্তনীচিত্র।

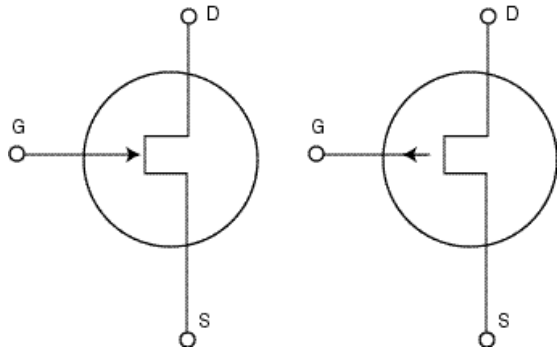

(ক) n-চ্যানেল (খ) p-চ্যানেল

চিত্র–১৪.২৯। (ক) n-চ্যানেল, (খ) p-চ্যানেল JFET এর প্রতীক চিহ্ন।

কার্যপ্রণালী ঃ

চিত্র–১৪.২৮ এ ড্রেনে প্রযুক্ত সম্মুখ বায়াস V_{DS} এবং গেটে প্রযুক্ত বিপরীত বায়াস V_{GS} দেখানো হয়েছে। নিম্নে n-চ্যানেল FET কিভাবে কাজ করে আলোচনা করা হলো।

(ক) যখন $V_{GS} = 0$ এবং $V_{DS} = 0$

অর্থাৎ ড্রেন ও উৎস এবং গেট ও উৎসের মধ্যে যখন কোন ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় না, সে অবস্থায় pn জাংশনের পাশে সৃষ্ট ডিপ্লিশন বা নিরপেক্ষ অঞ্চল সুষম থাকে। ড্রেন ও উৎসে কোন ভোল্টেজ প্রয়োগ না করায় বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকে না।

(খ) যখন $V_{GS} = 0$ এবং $V_{GS} > 0$. অর্থাৎ ড্রেনে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন n-চ্যানেলর মধ্যদিয়ে চার্জবাহক ইলেকট্রন ধনাত্মক D প্রান্তর দিকে ধাবিত হয়। ফলে বহির্বর্তনীতে ড্রেন কারেন্ট I_D প্রবাহিত হয়। ক্রমান্বয়ে V_{DS} এর মান বেড়ে যখন V_P মানে, পৌঁছায়, সে অবস্থায় ড্রেন কারেন্ট I_D সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়। এরপর V_{DS} বৃদ্ধি করলেও I_D এর মান পরিবর্তন হয় না। ড্রেন ভোল্টেজ আরো বাড়ালে BV_{DS} ভোল্টেজে পৌঁছাবে যখন হঠাৎ I_D অনেক বেড়ে যাবে। এ ভোল্টেজকে বলা হয় ভাজক ভোল্টেজ বা ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ (Breakdown voltage)। এ অবস্থায় পরমাণুর মধ্যে সমযোজী গ্রন্থি ভেঙ্গে যায়, ফলে অনেক চার্জ বাহক সৃষ্টি হয় এবং কারেন্ট বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। এ অবস্থায় FET নষ্ট হয়ে যাবে। প্রস্তুতকারকরা তাদের ডাটাসীটে এ ভোল্টেজের মান উল্লেখ করে থাকে। চিত্র–১৪.৩০ এ ড্রেন কারেন্ট ও ড্রেন ভোল্টেজের একটি লেখচিত্র দেখানো হয়েছে।

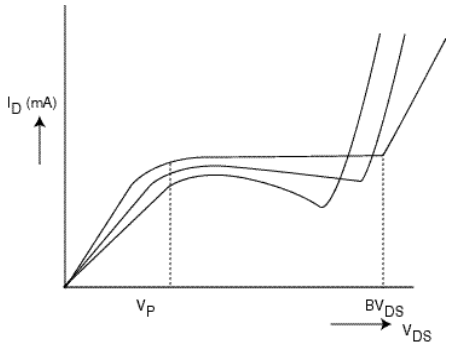

চিত্র–১৪.৩০

(গ) যখন V_{GS} ঋণাত্মক অর্থাৎ V_{GS} <o এবং V_{DS} >1

এ অবস্থায় গেটে V_{GS} এর ঋণাত্মক প্রান্ত এবং V_{DS} এর ধনাত্মক প্রান্ত D এর সংযোগ দেয়া হয়। তখন গেটে বিপরীত বায়াস প্রযুক্ত হয়। এর ফলে ডিপ্লিশন স্তর বা নিরপেক্ষ স্তরের বেধ বেড়ে যায় এবং চ্যানেলের প্রস্থ কমে যায়। গেটে বিপরীত বায়াস যত বাড়বে নিরপেক্ষ ততবৃদ্ধি পাবে এবং এক পর্যায়ে চ্যানেলের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন প্রবাহ থাকে না এবং চ্যানেল 'কাটঅফ' (Cut-off) হয়েছে বলা হয়। চিত্র–১৪.৩০ এ V_{GS} এর পরিবর্তনের সঙ্গে I_D এর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

৩.৪.৪ ঃ FET এবং বাইপোলার (Bipolar) ট্রানজিস্টরের পার্থক্য

FET এবং বাইপোলার ট্রানজিস্টরের পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

(ক) FET এ এক ধরনের চার্জ বাহক কাজ করে। পক্ষান্তরে বাইপোলার ট্রানজিস্টরে উভয় ধরনের ইলেকট্রনের ও হোল বাহক থাকে।

(খ) বাইপোলার ট্রানজিস্টরে ইনপুট বর্তনীতে সম্মুখ বায়াস প্রয়োগ করা হয়, ফলে ইনপুট রোধ কম মানের হয়। কিন্তু FET এর গেটে বিপরীত বায়াস প্রয়োগ করা হয়, ফলে ইনপুট রোধের মান খুবই বেশি হয়।

(গ) FET হলো ভোল্টেজ বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস। সাধারণ বা বাইপোলার ট্রানজিস্টর বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।

৩.৪.৫ ঃ FET এর ব্যবহার

১। বাইপোলার ট্রানজিস্টর যে সমস্ত কাজে ব্যবহার করা হয়, FET ও একই ধরনের কাজ করতে পারে। এছাড়াও FET অনেক কাজে ব্যবহৃত হয় যেখানে বাইপোলার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা যায় না।

২। FET এর ইনপুটে উচ্চ রোধ এবং আউটপুটে স্বল্প পরিমাণের রোধ থাকায় বাইপোলার ট্রানজিস্টরের চেয়ে FET উন্নতমানের। এ কারণে FET এর ব্যবহারও বেশি।

৩। FET এর ইনপুটে উচ্চ রোধ থাকায় বর্তনীতে লোর্ডিং ক্রিয়া খুব কম হয়। তাই উন্নতমানের ভোল্টমিটার, দোলনদর্শী (Oscilloscope), বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রপাতিতে FET এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

৪। লজিক বর্তনীতে (logic circuit) FET বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

৫। ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য LSI বর্তনী এবং কম্প্যুটারের মেমোরিতে FET ব্যবহার করা হয়।

৬। মিশ্রণ ক্রিয়া সম্পাদনে Fm, TV ইত্যাদি গ্রাহকযন্ত্রে FET ব্যবহার করা হয়।

৩.৪.৬ ঃ অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier) বা বিবর্ধক যন্ত্র

কোন কিছুর মান বাড়ানোকে অ্যামপ্লিফাই (Amplify) বা বিবর্ধন করা বলে। যে যন্ত্র বা ডিভাইস দ্বারা এ বিবর্ধন করা হয় তাকে অ্যামপ্লিফায়ার বলে। ইলেকট্রনিক্সে অ্যামপ্লিফায়ার বৈদ্যুতিক সিগন্যাল এর মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ট্রানজিস্টর

ইনপুটে প্রদত্ত সিগন্যালকে আউটপুটে বহুগুণ বাড়াতে পারে বলে একে বিবর্ধক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা এ অংশে একটি বাইপোলার ট্রানজিস্টর কিভাবে বিবর্ধকের কাজ করে তা বর্ণনা করবো।

ট্রানজিস্টর সিগন্যালের মাত্রা (level) কে দু'রকমভাবে বাড়াতে পারে। যথা) (১) বেস কারেন্টের সাহায্যে কালেক্টর কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং (২) ইনপুটের রোধের তুলনায় আউটপুটের রোধের মান বেশি ব্যবহার করে।

ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার বর্তনীতে ব্যবহারের সময় এমিটারকে সম্মুখ ঝোঁকে বা বায়াসে এবং কালেক্টরকে বিপরীত ঝোঁকে রাখা হয়। বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করার জন্য তিনভাবে সংযোগ দেয়া যায়।

(ক) কমন বেস (Common base) বা সাধারণ ভূমি

(খ) কমন এমিটার (Common emitter) বা সাধারণ নিঃক্লিসারক

(গ) কমন কালেক্টর (Common collector) বা সাধারণ সংগ্রাহক।

চিত্র–১৪.৩১ এ তিন ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার সংযোগ দেখানো হয়েছে।

তিন ধরনের বর্তনী সংযোগের মধ্যে কমন এমিটার বর্তনী সবচেয়ে কার্যকরী, তাই এর ব্যবহারও অনেক বেশি। সুতরাং নিচে একটি কমন এমিটার অ্যামপ্লিফায়ার আলোচনা করা হলো।

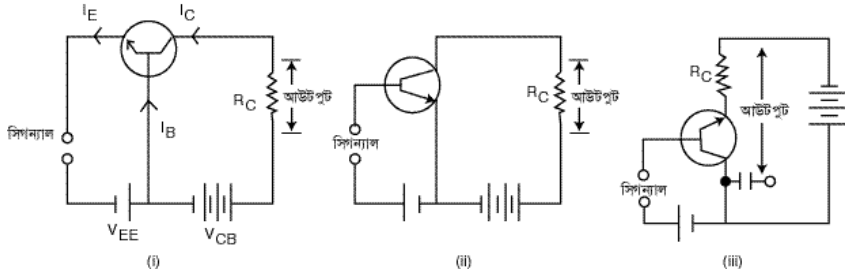

চিত্র–১৪.৩১। তিন ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার সংযোগ (i) কমন বেস (ii) কমন এমিটার (iii) কমন কালেক্টর।

কমন এমিটার বিবর্ধক (Common Emitter Amplifier)

চিত্র–১৪.৩২ এ n-p-n এবং p-n-p উভয় ধরনের কমন এমিটার বিবর্ধকের বর্তনী সংযোগ দেখানো হয়েছে।

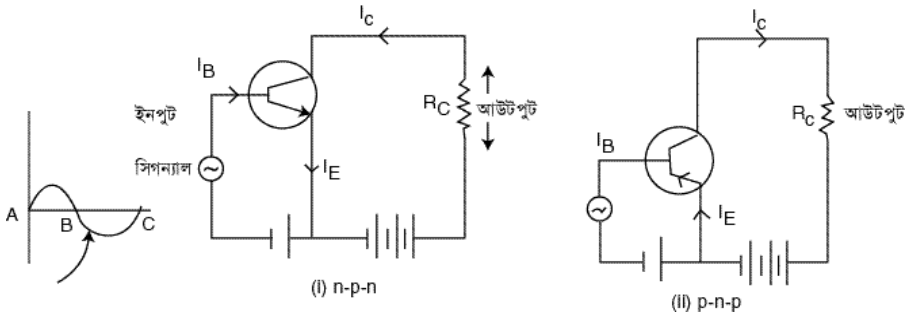

চিত্র–১৪.৩২

এক্ষেত্রে ইনপুট সিগন্যাল বেস ও এমিটারের মধ্যে প্রয়োগ করা হয় এবং কালেক্টর ও এমিটারের প্রান্তে সংযুক্ত রোধ R_C এর দু'প্রান্ত থেকে আউটপুট নেয়া হয়। এমিটার যেহেতু ইনপুট এবং আউটপুট উভয়ের জন্য কমন বা সাধারণ তাই এর নামকরণ করা হয়েছে কমন এমিটার বিবর্ধক।

লক্ষ্যণীয় যে, বর্তনীতে এসি সিগন্যাল, যাকে বিবর্ধিত করা হবে, ছাড়াও একটি ব্যাটারী V_{BB} ইনপুট সার্কিটে সংযুক্ত করা হয়েছে। V_{BB} এর ডিসি ভোল্টেজকে বলা হয় বায়াস ভোল্টেজ। এর মান এমন হতে হবে যেন এসি সিগন্যালের ঋণাত্মক অংশের জন্য কখনোই এমিটার বেস জাংশন বিপরীত ঝোঁকে না যায়। অর্থাৎ এ ভোল্টেজ এমিটার বেস জাংশনকে সম্মুখ ঝোঁকে রাখে। কেননা সিগন্যালের কোন অংশের জন্য এমিটার বেস জাংশন বিপরীত ঝোঁক প্রাপ্ত হলে ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে প্রবাহ আসবে না ফলে আউটপুট বর্তনীতে কোন প্রবাহ পাওয়া যাবে না। এতে ইনপুটে সিগন্যালের যে কোন রকম পরিবর্তন নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে অ্যামপ্লিফায়ার বিশ্বস্ততা (Faithfullness) হারাবে।

কার্যপ্রণালী ঃ

চিত্র–১৪.৩২ এ এমিটার বেস জাংশনে এসি সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয়েছে। এখন সিগন্যালের ধনাত্মক অর্ধাংশ AB এর জন্য এমিটার বেস জাংশনটি সম্মুখ ঝোঁকে থাকে। ফলে অধিক পরিমাণ ইলেকট্রন এমিটার থেকে বেসের ভিতর দিয়ে কালেক্টরে পৌঁছায় এবং কালেক্টরের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। কালেক্টর প্রবাহ ভাররোধ (load resistance) R_C এ অধিক পরিমাণ বিভব পতন (Voltage drop) ঘটায়। বিভব পতনের পরিমাণ হবে R_C I_C । R_C এর মান অনেক বেশি বলে বিভব পতন বেশি হয়।

সিগন্যালের ঋণাত্মক অর্ধাংশ (BC) এর জন্য এমিটার বেস জাংশনের সম্মুখ ঝোঁক কমে যায় ফলে কালেক্টর প্রবাহের মাত্রাও কম হয়। কালেক্টর প্রবাহ কম হওয়ায় R_C এ বিভব পতন কম হয় অর্থাৎ আউটপুট ভোল্টেজ বিপরীত দিকে কম হবে। এভাবে ট্রানজিস্টর বিবর্ধিত আউটপুট উৎপন্ন করে। সময়ের সঙ্গে কালেক্টরের প্রবাহ চিত্র–১৪.৩৩ এ দেখানো হয়েছে। যখন কোন সিগন্যাল এমিটার বেস জাংশনে দেয়া হয় না, সে অবস্থায় V_{BB} এর জন্য কালেক্টরে যে অপরিবর্তিত বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায় তা চিত্রে i_C দ্বারা দেখানো হয়েছে।

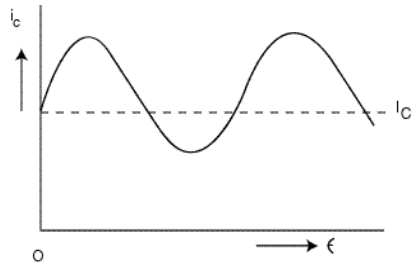

চিত্র–১৪.৩৩

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, i_C এর মান ইনপুট সিগন্যালের মানের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। ট্রানজিস্টর কি এবং কত প্রকার?

২। n-p-n বা p-n-p ট্রানজিস্টরে কয়টি জাংশন থাকে?

৩। ট্রানজিস্টর কি কাজে ব্যবহার হয়?

৪। কালেক্টর অঞ্চল, বেস এবং এমিটারের তুলনায় বেশি প্রশস্ত করা হয় কেন?

৫। বেস অঞ্চল, পাতলা এবং কম পরিমাণে ডোপিং করা হয় কেন?

৬। এমিটার কারেন্টের তুলনায় কালেক্টর কারেন্টের মান কম হয় কেন?

৭। n-p-n এবং p-n-p ট্রানজিস্টরের প্রতীক চিহ্ন কি?

৮। FET কি? বাইপোলার ট্রানজিস্টরের সঙ্গে FET-এর পার্থক্য কি?

৯। FET এবং বাইপোলার ট্রানজিস্টরের মধ্যে ইনপুট রোধ কোনটির বেশি?

১০। FET মূলত: কয় ধরনের এবং কি কি?

১১। n-চ্যানেল এবং p-চ্যানেল FET এর পার্থক্য কি?

১২। FET এ গেইট এর ভূমিকা কি?

১৩। কারেন্ট গেন ফ্যাক্টর α ও β কি?

১৪। α এবং β এর মধ্যে সম্পর্ক কি?

১৫। ট্রানজিস্টরে বায়াসিং কেন করা হয়?

১৬। সংযোগের বিভিন্নতা অনুসারে অ্যামপ্লিফায়ার কয় প্রকার ও কি কি?

১৭। কমন এমিটার অ্যামপ্লিফায়ার বর্তনীতে ইনপুট সিগন্যাল কোথায় প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ ৫ সমন্বিত বর্তনী (Integrated circuit)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সমন্বিত বর্তনী কি বলতে পারবেন;
- সমন্বিত বর্তনীর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সমন্বিত বর্তনীর গঠন প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাবস্ট্রেট, এপিট্যাক্সিয়াল স্তর, মাস্কিং কাকে বলে বলতে পারবেন;
- সমন্বিত বর্তনীর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাইক্রোপ্রসেসর কি বলতে পারবেন।

ভূমিকা

ট্রানজিস্টরের আবিষ্কারের আগে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, রেডিও ইত্যাদিতে ভ্যাকুয়াম টিউব (Vacumm tube) ব্যবহার করা হতো। ভ্যাকুয়াম টিউব আকারে বড় হওয়ায় এবং ওজন বেশি হওয়ায় ইলেকট্রনিক বর্তনী অনেক বড় আকারের হতো এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ওজনও বেশি ছিল। ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের পর এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্তনীতে সংযুক্ত বিভিন্ন আকার ছোট করার চেষ্টা করা হয় এবং আস্তে আস্তে যন্ত্রপাতির আকার ছোট এবং ওজনে কম হতে থাকে। আগে বর্তনীর বিভিন্ন অংশের সংযোগ বাহ্যিকভাবে পরিবাহী তার দিয়ে করা হতো। পরবর্তীতে প্রিন্টেড বর্তনী বোর্ড তৈরি হওয়ায় বর্তনীর সাইজ আরও ছোট হয়। এ সমস্ত বর্তনীতে সকল পার্টস যেমন, ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটর, রোধ ইত্যাদি পৃথক সংযোগ দিয়ে তৈরি করা হয় বলে এ ধরনের বর্তনীকে ডিসক্রীট বর্তনী (Discrete circuit) বলা হয় বড় ধরনের বর্তনীতে যেমন, টেলিভিশন, রাডার, কম্পিউটার, রকেট ইত্যাদিতে অনেক সংখ্যক পার্টস ব্যবহার করতে হয় বিধায় এগুলোর জন্য বর্তনীতে অনেক জায়গার প্রয়োজন হয়। এছাড়া সংযোগের সংখ্যা যত বাড়ে ভুল সংযোগ বা ত্রুটিযুক্ত সংযোগের সম্ভাবনাও বেড়ে যেতে পারে। ফলে এ ধরনের সার্কিট বা বর্তনীর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক কম হয়। তাই বর্তনীর জায়গা কমানো, হাল্কা করা, রকেট, সামরিক ইত্যাদি প্রয়োজনে এবং সর্বোপরি সার্কিটের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর তাগিদে ষাটের দশকের শুরুতে এক ধরনের মাইক্রো বা ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক্স-এর উদ্ভব হয়। একেই সমন্বিত বর্তনী (Integrated circuit, IC) বা সংক্ষেপে আই.সি বলে। আই.সি হচ্ছে যে কোন একটি স্টেজের সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক্স বর্তনী। একটা আই.সি এক বা একাধিক স্টেজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। বর্তনীর একটি স্টেজের জন্য সকল পার্টস যেমন– ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটর, রোধ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় এবং এদের মধ্যে সংযোগ দিতে হয়। আইসি এর মধ্যে এগুলোর সবই একটা ছোট অংশ যাকে চিপ (Chip) বলা হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ ধরনের বহু চিপ একসঙ্গে তৈরি করে পরে প্রয়োজনমতো কেটে নেওয়া হয়। চিপের অন্তর্গত কোন পার্টসকে আলাদা করা যায় না। ফলে কোন একটি নষ্ট হলে সম্পূর্ণ চিপ বদল করতে হয়। চিপ মূলত: সিলিকনের তৈরি একটি সলিড স্টেট ডিভাইস।

৩.৫.১ ঃ সমন্বিত বর্তনীর গঠন প্রণালী

সমন্বিত বর্তনী তৈরির জন্য সাধারণত: চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা– (ক) মনোলিথিক (খ) পাতলা ফিল্ম (গ) স্থুল ফিল্ম এবং (ঘ) হাইব্রিড (Hybrid) বা শংকর পদ্ধতি। চারটি পদ্ধতির মধ্যে মনোলিথিক পদ্ধতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাই এ অংশে সমন্বিত বর্তনী তৈরির মনোলিথিক পদ্ধতি বর্ণনা করা হবে।

৩.৫.২ ঃ মনোলিথিক সমন্বিত বর্তনী তৈরির পদ্ধতি

মনোলিথিক সমন্বিত বর্তনীর সকল উপাদান (parts) এবং এদের মধ্যে আন্ত:সংযোগ একটি অত্যন্ত পাতলা ওয়েফার এর উপর করা হয়। এ ওয়েফারকে স্যাবস্টেট বলে। সমন্বিত বর্তনীর তৈরির পর্যায়ক্রমিক ধাপ নিচে বর্ণনা করা হলো।

(i) p-সাবস্টেট তৈরি ঃ সমন্বিত বর্তনী তৈরির এটি প্রথম ধাপ। একটি বড় আকারের p-টাইপ সিলিকন কেলাস তৈরি করে ডায়মন্ড করাত দিয়ে খুবই পাতলা প্রচুর পরিমাণ ওয়েফার কেটে নেয়া হয়। ওয়েফারের বেধ (Thickness) সাধারণত: ২০০ μm হয়। এ ওয়েফারের একপৃষ্ঠ বিশেষ পদ্ধতিতে মসৃণভাবে ঘষে নেয়া হয় এবং পরিষ্কার করা হয় যাতে এর পৃষ্ঠে কোন বাহ্যিক অপদ্রব্য মিশ্রিত না থাকে। এ ওয়েফারকে বলা হয় সাবস্ট্রেট। p-টাইপ সিলিকন থেকে তৈরি হলে একে বলে p-সাবট্রেট আবার n-টাইপ সিলিকন থেকে তৈরি করলে বলা হয় n-সাবস্ট্রেট। সাধারণত:p-সাবস্ট্রেটই বেশি ব্যবহার করা হয়।

(ii) এপিট্যাক্সিয়াল n-স্তর (Epitaxial n-layer) তৈরি ঃ এপিট্যাক্সিয়াল n-স্তর তৈরির জন্য p-সাবস্ট্রেটকে ডিফিউশন (Diffusion) বা প্রসারণ চুল্লিতে স্থাপন করা হয়। এরপর উচ্চতাপে সিলিকন পরমাণু ও পঞ্চযোজী পরমাণুর মিশ্রিত গ্যাস ওয়েফারের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে p-সাবস্ট্রেটের উত্তপ্ত পৃষ্ঠে n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর একটি স্তর জমা হয়। এ পাতলা স্তরকেই এপিট্যাক্সিয়াল স্তর (Epitaxial layer) বলা হয়। এ স্তরের বেধ সাধারণত 10μm হয়। এ স্তরের মধ্যে সমন্বিত বর্তনীর বিভিন্ন অংশ বিশেষ পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়।

(iii) অক্সাইড কোটিং বা মাস্কিং করা (Oxide coating or masking) ঃ এপিট্যাক্সিয়াল স্তর ঢাকনা বিহীন থাকলে এর উপরে ধুলাবালি এবং অন্যান্য অপদ্রব্য জমা হয়ে দূষিত করে ফেলতে পারে। এজন্য এর উপরে সিলিকন ডাইঅক্সাইড এর একটা পাতলা স্তর (সাধারণত: 1μm বেধের) তৈরি করা হয়। অক্সাইড স্তর বা মাস্কিং তৈরির জন্য উচ্চতাপে অক্সিজেন গ্যাস এটিপ্যাক্সিয়াল স্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। প্রবাহিত অক্সিজেন পৃষ্ঠের উপরে একটি অক্সাইড স্তর তৈরী করে। সমন্বিত বর্তনীর বিভিন্ন পার্টস বা কম্পোনেন্টস ওয়েফারের বিভিন্ন অংশ থেকে অক্সাইড স্তর সরিয়ে ঐ বিশেষ জায়গায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কম্পোনেন্টস প্রতিস্থাপন করা হয়। অক্সাইড সরানোর জন্য হাইড্রোক্লোরিক এসিড ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন পার্টস বা কম্পোনেন্টস প্রতিস্থাপনের জন্য ডিফিউশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয় জায়গার অক্সাইড সরানোর পদ্ধতিকে এচিং (etching) বলা হয়। বিভিন্ন পার্টসের সংযোগ দেয়ার জন্য এচিং পদ্ধতি অনুসরণ করে অক্সাইড স্তর সরিয়ে তরল পরিবাহী ফাঁকা জায়গায় জমিয়ে সংযোগ দেয়া হয়। সমন্বিত তৈরির বিভিন্ন স্তর চিত্র–১৪.৩৪ এ দেখানো হয়েছে।

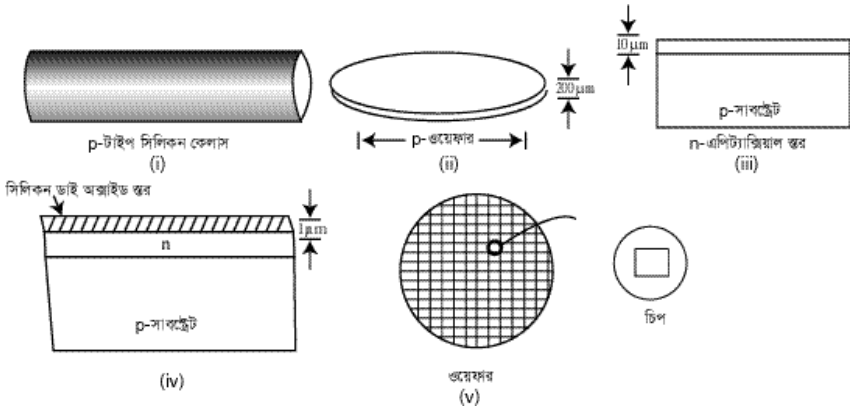

চিত্র–১৪.৩৪

চিত্র–১৪.৩৪ (v) এ একটি ওয়েফার থেকে বহু অংশ কেটে নেয়া হয়েছে– যার প্রত্যেকটি এক একটি চিপ। সুতরাং একটি ওয়েফার থেকে বহু সংখ্যক চিপ একই সঙ্গে তৈরি করা যায়। এ সমস্ত চিপের গুণাবলী প্রায় অভিন্ন হয়। এ চিপই হল একটি সমন্বিত বর্তনী যার মধ্যে বহু জটিল সংযোজন করা থাকে।

চিত্র–১৪.৩৫ এ একটি চিপের মধ্যে সৃষ্ট একটি ডায়োড ও ট্রানজিস্টর বোঝার সুবিধার জন্য আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এরূপ বহুসংখ্যক ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রোধ, ক্যাপাসিটর একটি চিপে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

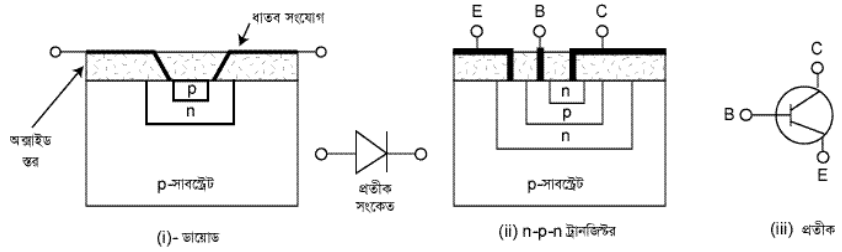

চিত্র–১৪.৩৫

ওয়েফার থেকে চিপ কেটে নেওয়ার পর এটিকে শক্ত ফ্রেমের মধ্যে স্থাপন করা হয় যাতে চিপের গায়ে কোন আঘাত না লাগে বা বাইরের বস্তু দ্বারা সংক্রমিত না হয়। ফ্রেমের বাইরে বিভিন্ন সংযোগ প্রান্ত বের করে আনা হয়। বাজারে যে সমস্ত সমন্বিত বর্তনী পাওয়া যায় তাদের চিত্র ও প্রতীক চিহ্ন চিত্র–১৪.৩৬ এ দেখানো হলো।

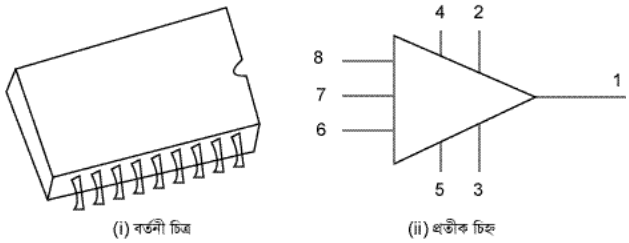

চিত্র–১৪.৩৬

৩.৫.৩ ঃ সমন্বিত বর্তনীর শ্রেণীভেদ

সমন্বিত বর্তনীর ইন্টিগ্রেশন ক্ষমতা বা বর্তনী ও কম্পোনেন্টস এর সংখ্যা অনুযায়ী এগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন–

(i) স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Small-Scale Integration), সংক্ষেপে SSI.

(ii) মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশন (medium scale integration)

(iii) লার্জস্কেল ইন্টিগ্রেশন (Large scale integration)

(iv) ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Very large scale integration)

(v) মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor)

(i) স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Small-Scale Integration), সংক্ষেপে SSI.

এ ধরনের একটি সমন্বিত বর্তনী প্যাকেজের মধ্যে 30 এর কম বর্তনী এবং 50 এর কম কম্পোনেন্টস থাকে।

(ii) মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশন (medium scale integration)

এ ধরনের সমন্বিত বর্তনীর মধ্যে বর্তনীর সংখ্যা 30 টি থেকে 100টি পর্যন্ত এবং কম্পোনেন্টস 50 থেকে 500 টি পর্যন্ত থাকে।

(iii) লার্জস্কেল ইন্টিগ্রেশন (Large scale integration)

এক্ষেত্রে বর্তনীর সংখ্যা 100 থেকে 100,000 পর্যন্ত হতে পারে এবং 500 থেকে 300,000 পর্যন্ত কম্পোনেন্টস থাকতে পারে।

(iv) ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Very large scale integration)

এতে লক্ষাধিক বর্তনী থাকে।

(v) মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor)

এটা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টস এর সমষ্টিমাত্র নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সিস্টেম। মাইক্রোপ্রসেসর প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারে। প্রত্যেক মাইক্রোপ্রসেসরে কতগুলো নির্দেশ সংযুক্ত থাকে সেগুলো এটি বুঝতে পারে এবং সে অনুসারে কাজ করতে পারে। এ নির্দেশ বা (Instruction) কে বলে প্রোগ্রাম। মাইক্রোপ্রসেসর অনেক কাজই করতে পারে। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বর্তনী একটি চিপের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। সমন্বিত বর্তনী কি?

২। সমন্বিত বর্তনীর মূল্য কম হওয়ার কারণ কি?

৩। IC কয়ভাবে তৈরি করা হয় এবং কি কি?

৪। সমন্বিত বর্তনীর যোগ্যতা অনেক বেশি কেন?

৫। এপিট্যাক্সিয়াল স্তর কি?

৬। অক্সাইড স্তর তৈরির প্রয়োজনীয়তা কি?

৭। ইন্টিগ্রেটিং ক্ষমতা অনুসারে IC কয়ভাগে ভাগ করা হয় এবং কি কি?

৮। সাবস্ট্রেট কি? এর কাজ কি?

বহু নির্বাহনী প্রশ্নাবলী

১। অর্ধপরিবাহী বস্তুর আপেক্ষিক রোধের মান কি রকম?

(ক) ধাতব ও অন্তরকের চেয়ে বেশি

(খ) ধাতব ও অন্তরকের মধ্যবর্তী

(গ) ধাতব ও অন্তরকের প্রায় কাছাকাছি

(ঘ) ধাতব ও অন্তরকের চেয়ে কম।

২। অর্ধপরিবাহী বস্তুর পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল গ্রন্থি কি ধরনের?

(ক) আয়নিক (খ) ধাতব

(গ) সমযোজী (ঘ) হাইড্রোজেন বন্ড।

৩। সিলিকন বা জার্মেনিয়াম অর্ধপরিবাহীতে যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা কয়টি?

(ক) চারটি (খ) তিনটি

(গ) দুইটি (ঘ) একটি।

৪। n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে কোন ধরনের অপদ্রব্য মিশ্রিত করা হয়?

(ক) দ্বিযোজী মৌল (খ) পঞ্চযোজী মৌল

(গ) ত্রিযোজী মৌল (ঘ) চতুর্যোজী মৌল।

৫। p-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে কোন ধরনের মৌল মিশ্রিত করা হয়?

(ক) দ্বিযোজী (খ) পঞ্চযোগী

(গ) ত্রিযোজী (ঘ) চতুর্যোজী।

৬। সহজাত বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন ও হোলের সংখ্যা কিরূপ?

(ক) সমান (খ) ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশী

(গ) হোলের সংখ্যা বেশি (ঘ) হোল একেবারেই থাকে না।

৭। সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগে একটি ডায়োডকে মনে হবে–

(ক) বদ্ধ (On) সুইচ (খ) খোলা (Off)

(গ) উচ্চরোধক (ঘ) ক্যাপাসিটর।

৮। বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগে একটি ডায়োডকে মনে হবে–

(ক) বদ্ধ (On) সুইচ (খ) খোলা (Off) সুইট

(গ) একটি উচ্চরোধক (ঘ) একটি ক্যাপাসিটর।

৯। LED তৈরির জন্য কোন অর্ধপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়?

(ক) সিলিকন (খ) জার্মেনিয়াম

(গ) ফসফরাস (ঘ) গ্যালিয়াম আর্সেনাইড।

১০। LED কোন অবস্থায় আলো বিকিরণ করে?

(ক) যখন সম্মুখ ঝোঁকে থাকে (খ) যখন বিপরীত ঝোঁকে থাকে

(গ) যখন কোন ঝোঁক প্রয়োগ করা হয় না

(ঘ) যখন তাপমাত্রার পরিবর্তন করা হয়।

১১। রেকটিফায়ার কয় ধরনের?

(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের

(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের।

১২। LED হতে নিঃসৃত আলোর রং নির্ভর করে–

(ক) এর সম্মুখ ঝোঁকের উপর (খ) এর বিপরীত ঝোঁকের উপর

(গ) সম্মুখ বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর (ঘ) যে অর্ধপরিবাহী দিয়ে তৈরী তার বৈশিষ্ট্যের উপর

১৩। সৌর কোষ কি ধরনের ডিভাইস?

(ক) p-n জাংশন ডিভাইস (খ) একটি ট্রানজিস্টর ডিভাইস

(গ) একটি অর্ধপরিবাহী ডিভাইস (ঘ) ধাতব অর্ধপরিবাহী ডিভাইস

১৪। একটি ট্রানজিস্টর কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়–

(ক) রেকটিফায়ার হিসেবে (খ) অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে

(গ) বিদ্যুৎকোষ হিসেবে (ঘ) জেনারেটর হিসেবে।

১৫। FET একটি–

(ক) বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস (খ) দুই টার্মিনাল সংযুক্ত ডিভাইস

(গ) বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস (ঘ) চার টার্মিনাল ডিভাইস।

১৬। FET এ থাকে–

(ক) উৎস (খ) ড্রেন

(গ) গেট (ঘ) সবকটি।

১৭। JFET-এ ড্রেন কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে মূলত:

(ক) চ্যানেল রোধ (খ) চ্যানেলের মধ্যে বিভব পার্থক্য

(গ) ডিপ্লিশন অঞ্চলের আকারের উপরে (ঘ) গেট বিপরীত বায়াস।

১৮। JFET এ ড্রেন কারেন্ট সর্বোচ্চ মানের হয় যখন V_{GS}

(ক) শূন্য থাকে (খ) ধনাত্মক হয়

(গ) ঋণাত্মক হয় (ঘ) $V_{GS} = V_P$

১৯। I_C এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো–

(ক) বর্তনী অচল হলে সহজে পরিবর্তন করা যায়

(খ) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যতা

(গ) খুব কম খরচ

(ঘ) সামান্য শক্তি ব্যয়।

২০। মনোলিথিক I_C এর সকল কম্পোনেন্টস্ তৈরি করা হয়–

(ক) Evaporation পদ্ধতিতে (খ) Diffusion পদ্ধতিতে

(গ) Oxidation পদ্ধতিতে (ঘ) Sputtering পদ্ধতিতে।